বৈষ্ণব প্রদীপ ১০

বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত

শ্রী মনোরঞ্জন দে

বৈষ্ণব প্রদীপ
(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

দশম খণ্ড

বৈষ্ণব প্রদীপ

(বৈষ্ণব ধর্মের বহু প্রশ্নের উত্তর সম্বলিত)

দশম খণ্ড

শ্রী মনোরঞ্জন দে

সূর্যোদয়

প্রথম প্রকাশ
সেপ্টেম্বর ২০১২

প্রকাশক
শ্রী মৃত্যুঞ্জয় পাল
সূর্যোদয়
৩৮/৪ বাংলাবাজার, ঢাকা ১১০০
মোবা. ০১৯১২ ৫২৬৫৫৪
০১৬৮১৬৫১৩৫৫

কম্পোজ
বাংলাবাজার কম্পিউটার
৩৪ নর্থব্রুক হল রোড ঢাকা ১১০০

ভিক্ষা মূল্য : ৩০.০০ টাকা

উৎসর্গ

নিত্যলীলায় প্রবিষ্ট
পরম পূজ্যপাদ বৈষ্ণব মহাজন
শ্রীল ভক্তিবিলাস তীর্থ গোস্বামী
মহারাজ-এর করকমলে।

লেখকের বইসমূহ

১. বৈষ্ণব সম্প্রদায়
২. বৈষ্ণব নামধারী অপ-সম্প্রদায়
৩. দ্বাদশ গোপাল চৌষট্টী মহান্ত
৪. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তর্ধান লীলা
৫. শ্রী শ্রী রাধা তত্ত্ব
৬. শ্রী নৃসিংহদেব
৭. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১ম খণ্ড
৮. বৈষ্ণব প্রদীপ : ২য় খণ্ড
৯. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৩য় খণ্ড
১০. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৪র্থ খণ্ড
১১. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৫ম খণ্ড
১২. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৬ষ্ঠ খণ্ড
১৩. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৭ম খণ্ড
১৪. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৮ম খণ্ড
১৫. বৈষ্ণব প্রদীপ : ৯ম খণ্ড
১৬. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১০ম খণ্ড
১৭. বৈষ্ণব প্রদীপ : ১১তম খণ্ড

পরবর্তী বই

১. মহাপ্রভুর বাল্যলীলা
২. মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলা
৩. হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র
৪. মহাভারতের যুগে সেনাবাহিনীর গঠন কাঠামো, যুদ্ধাস্ত্র এবং যুদ্ধকৌশল
৫. সর্বোত্তম অর্থনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ
৬. সর্বোত্তম রাজনীতিবিদ শ্রীকৃষ্ণ

লেখকের নিবেদন

প্রথমেই আমার পরমারাধ্য শ্রীগুরুদেব কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্ত্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ-এর শ্রীচরণকমলে শতকোটি দণ্ডবৎ প্রণতি নিবেদন করছি।

নমো ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিবেদান্ত স্বামীন্ ইতি নামিনে ॥
নমস্তে সারস্বতে দেবং গৌরবাণী প্রচারিণে।
নির্বিশেষ শূন্যবাদী পাশ্চাত্যদেশ তারিণে ॥

সনাতন ধর্ম অত্যন্ত ব্যাপক এবং বিশাল। এই ধর্মের মধ্যে বিশ্বের সবকিছুই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে নিহিত আছে। বেদ, উপনিষদ, ভগবদ্‌গীতা, অষ্টাদশ পুরাণ, মহাভারত, রামায়ণ এবং বৈষ্ণব সাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে সব ধরনের জ্ঞানই অর্ন্তনিহিত আছে। কিন্তু এতসব গ্রন্থ বেশিরভাগ লোকের পক্ষেই পড়া, বোঝা এবং আত্মস্থ করা সম্ভব নয়।

একথা সত্য ব্যক্তিগতভাবে আমারও সব ধরনের বৈদিক শাস্ত্র গ্রন্থ পাঠ করার সুযোগ হয় নাই। যতটা সম্ভব পাঠ করেছি, তবে এখনও সব আত্মস্থ করার দুর্লভ সৌভাগ্য অর্জন করতে পারিনি। এজন্য এখনও পাঠ করে চলেছি। এই প্রক্রিয়ায় যে সামান্য জ্ঞান লাভ করেছি তার ফসল এই বইটি। আপাততঃ দশ খণ্ডে বিভক্ত এই বইতে দুই হাজার প্রশ্ন ও তার উত্তর সন্নিবেশ করা হয়েছে। ভবিষ্যতে বইটির আরও

পরিবর্ধন হতে পারে। তবে এই বইতে বেশিরভাগ প্রশ্ন ও উত্তর বৈষ্ণব ধর্মের আলোকে করা হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, এই বইটি আমার সৃষ্ট কিছু নয়। বিভিন্ন প্রামাণিক পুথি-পুস্তকের সহায়তায় এর সংকলন করা হয়েছে, ক্ষেত্রবিশেষে হুবহু তথ্য তুলে ধরেছি। তবে এই বইতে কোন প্রশ্নের উত্তর সম্পর্কে কারও কোন সংশয় এবং সন্দেহ হলে উপযুক্ত তথ্য এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণ দিয়ে প্রকাশকের কাছে পত্র লিখতে পারেন যাতে পরবর্তী সংস্করণে ভুল সংশোধন করা যায়। কারণ আমাদের লক্ষ্য হলো যে-কোন প্রশ্নের শাস্ত্রীয়ভাবে নির্ভুল উত্তর প্রদান।

যেসব গৌড়িয় ভক্ত এই দীন-অভাজনকে এই ধরনের একটি বই সংকলনের জন্য কৃপাশীর্বাদ করেছেন তাদের মধ্যে ভাগবত প্রবর শ্রী প্রেমরতন গোস্বামী, ভাগবতপ্রবর শ্রী মুকুল পদ মিত্র, ভক্তপ্রবর শ্রী দীপক দেবনাথ, ভক্তপ্রবর শ্রীজয় দেবনাথ, ভক্ত প্রবর শ্রী শম্ভুনাথ ঘোষ, ভক্তপ্রবর শ্রী কালিদাস পাল (এ্যাডভোকেট), ভক্তপ্রবর শ্রী প্রণব চৌধুরী, ভক্তপ্রবর শ্রী সত্যরঞ্জন সরকার, ভক্তপ্রবর শ্রী নিমাই বসু, ভক্তপ্রবর শ্রী হরিপদ দত্ত, ভক্তিন শ্রীমতি লক্ষ্মী রাণী দত্ত, ভক্তপ্রবর শ্রী নন্দগোপাল সাহা, ভক্তপ্রবর শ্রী সঞ্জয় মোদক, ভক্তপ্রবর শ্রী চন্দন পোদ্দার, ভক্তপ্রবর শ্রী কৌশিক দাসাধিকারী, ভক্তপ্রবর শ্রী সনাতন দাস, ভক্তপ্রবর শ্রী রঞ্জিত কুমার মজুমদার, ভক্তপ্রবর শ্রী দিলীপ কুমার বল অন্যতম।

সবার শ্রীচরণে প্রণতি রইল।

বৈষ্ণব দাসানুদাস,
মনোরঞ্জন দে

প্রশ্ন : ১৬৭৮ ॥ মহাপাতকী কাদেরকে বলা হয় বা যায়?

উত্তর : ব্রাহ্মণ, সন্ন্যাসী, ভিক্ষু, ব্রহ্মচারী, স্ত্রী এবং বৈষ্ণব হত্যাকারীকে মহাপাতকী বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৬৭৯ ॥ কোন্ কাজ করলে একজনের মহাপাপ হবে?

উত্তর : গো (গরু), ব্রাহ্মণ, স্ত্রীলোক ও বালককে হত্যা এবং গুরুর স্ত্রী হরণ করলে মহাপাপ হবে।

প্রশ্ন : ১৬৮০ ॥ মহাপ্রসাদ গ্রহণে কোন বিচার আছে কি?

উত্তর : পুজার অধিকারী ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য কেউ স্পর্শ করলেও—বাইরে কোনও স্থানে, এমনকি বিদেশে অথবা অপবিত্র স্থানে নেয়া হলেও মহাপ্রসাদে ভক্ষ্য-অভক্ষ বিচার করতে নাই। (বৃহৎ ভাগবতামৃত ২/১/১৫৬-৬২)।

প্রশ্ন : ১৬৮১ ॥ মহাবৈকুণ্ঠ সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (২/৯/৯-১৬) বলা হয়েছে : শ্রী নারায়ণ শ্রীব্রহ্মাকে পরব্যোমস্থ মহাবৈকুণ্ঠ ধাম দেখাইয়াছেন। এই ধামে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ ও অভিনিবেশ—এই পাঁচ ধরনের ক্লেশ এবং অবিবেক ও পতনের ভয় নাই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুন অথবা কালের নিয়মও এই লোকে নাই। এই লোকে মায়ার কোন প্রভাবই নাই। সেখানে শ্রীহরির পার্ষদগণ প্রায় সকলেই শ্যামবর্ণ, চতুর্ভূজ এবং তাদের পরনে পীতবাস আছে। শ্রী লক্ষ্মীদেবী দোলায় উপবেশন করে

শ্রীহরির লীলা গান করেন। সুনন্দ, নন্দ, প্রবল ও অর্হন প্রমুখ পার্ষদগণ দ্বারা এই লোকে শ্রীহরি সেবিত হন।

পদ্মপুরান মতে শাশ্বত, নিত্য এবং অচ্যুত এই পরমধামে শ্রীলক্ষ্মী-নারায়ণের একান্ত ভক্তগণই গমন করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৬৮২ ॥ বৈকুণ্ঠের কয়টি দ্বার আছে? এইসব দ্বারের রক্ষীগণ কারা?

উত্তর : বৈকুণ্ঠের চারটি দ্বার আছে। এই চারদ্বারে আটজন দ্বারপাল আছেন। যেমন পূর্বদ্বারে চণ্ড ও প্রচণ্ড, দক্ষিনদ্বারে ভদ্র ও সুভদ্র, পশ্চিমদ্বারে জয় ও বিজয় এবং উত্তরদ্বারে ধাতা ও বিধাতা—এই আটজন দ্বারপাল আছেন।

প্রশ্ন : ১৬৮৩ ॥ জননী বা মাতা কত প্রকার হতে পারেন?

উত্তর : জননী বা মাতা ষোল ধরনের হতে পারেন : জননী, স্তন্যদাত্রী, গর্ভধারিনী, ভক্ষ্যদাত্রী, গুরুপত্নী, অভিষ্টদেব-পত্নী, বিমাতা, স্বকন্যা, সহোদরা, পুত্রবধু, শ্বশ্রু (শাশুড়ী), মাতামহী (দিদিমা), পিতামহী (ঠাকুমা) সহোদর পত্নী (ভাইয়ের স্ত্রী), মাতৃস্বসা (মাসীমা) এবং মাতুলানী (মামী)।

প্রশ্ন : ১৬৮৪ ॥ মানুষকে মায়াবদ্ধ জীব বলা হয়। এই মায়া বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : যাহা বাস্তব বস্তুর আবরণ করে—অর্থাৎ ঢাকিয়া রাখে, অথচ অবাস্তব বস্তুকে দেখায় তাহাই মায়া। মায়াশক্তি হলেন মহামায়া বা দশ হাত বিশিষ্ট দুর্গা। তিঁনিই জীবকে সংসার বন্ধনে আবদ্ধ করে রাখেন।

প্রশ্ন : ১৬৮৫ ॥ কালযবন মহারাজ মুচুকুন্দের দৃষ্টিপাতে ভস্মীভূত হয়। প্রশ্ন হল এই মুচুকুন্দ কে ছিলেন?

উত্তর : মুচুকুন্দ ছিলেন ইক্ষাকু বংশের রাজা মান্ধাতার পুত্র। বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রথম ত্রেতাযুগে তার জন্ম হয়। দৈত্যবধে দেবতাদেরকে তিনি সাহায্য করেন। যুদ্ধের শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে দেবতাদের বরে তিনি মথুরা মণ্ডলের দক্ষিন সীমায় ধবল-পুর নামক পর্বতের গুহায় নিদ্রিত থাকেন। কালযবন ভগবান কৃষ্ণকে অনুসরণ

করে সেখানে উপস্থিত হয় এবং ঘুমন্ত মুচুকুন্দকে কৃষ্ণ ভেবে পদাঘাত করে। মুচুকুন্দ নিদ্রা থেকে জাগরিত হয়ে তাঁর চোখের দৃষ্টি দ্বারা কালযবনকে ভস্মীভূত করেন। তখন তিনি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের দর্শন ও তাঁর কৃপা লাভ করেন। এরপর তিনি বদরিকা আশ্রমে গিয়ে তপস্যায় নিরত হন।

প্রশ্ন : ১৬৮৬ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মূরলীধরও বলা হয়। এই মূরলী কি?

উত্তর : মূরলী নামক এক ধরনের বংশী (বাঁশি) যখন ধারণ করেন এবং বাজান তখন কৃষ্ণকে মূরলীধর বলা হয়। এই বংশী দুই হাত লম্বা, মুখে একটি ছিদ্র এবং এতে স্বরের জন্য ভিন্ন চারটি ছিদ্র আছে।

প্রশ্ন : ১৬৮৭ ॥ ভগবানের এক নাম মুরারী। কেন এই নাম?

উত্তর : মূর নামক এক পঞ্চংশিরাঃ দৈত্য ছিল। সে ছিল বলিরাজের পার্ষদ। অরী শব্দের অর্থ শত্রু। এই দৈত্যকে ভগবান নিহত করেন। কাজেই মূর নামক শত্রুকে হত্যা করায় ভগবানের এক নাম মুরারী হয়েছে। (মুর + অরী = মুরারী)।

প্রশ্ন : ১৬৮৮ ॥ অচল এবং চলভেদে বিষ্ণুমূর্ত্তি নাকি দুই ধরনের?

উত্তর : হ্যাঁ। অচল ও চলভেদে বিষ্ণু মূর্ত্তি দুই ধরনের। অচল মূর্ত্তিকে আদি বাসুদেব বলা হয়। আর ভক্ত বাৎসল্য হেতু ভগবান যখন বিচরণ করেন তখন তার সেই মূর্ত্তিকে চল বলা হয়। যেমন সাক্ষী গোপাল। অচলমূর্ত্তি—প্রাসাদে বা মঠে অবস্থিত থাকেন। আর চলাচল মূর্ত্তি ভক্তের গৃহে থাকেন। (শ্রীহরিভক্তি বিলাস ১৯/৮২১-৮২৩)।

প্রশ্ন : ১৬৮৯ ॥ মল-মূত্র (পায়খানা ও প্রস্রাব) ত্যাগের ক্ষেত্রে শাস্ত্রীয় কোন বিধি নিষেধ আছে কি?

উত্তর : নিজের ছায়ায়, গাছের ছায়ায়, গরুর সম্মুখে, সূর্য, অগ্নি, বায়ু, গুরু ও ব্রাহ্মণের সম্মুখে মল-মূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। এছাড়া চাষ করা জমিতে, শস্যমধ্যে, গোচারণ ভূমিতে, জনসমাজে, পথের মধ্যে, নদী, তীর্থে, জলে, জলের ধারে এবং শশ্মানেও মল-মূত্র ত্যাগ নিষিদ্ধ। দণ্ডায়মান হয়ে অথবা গমন করতে করতেও মল-মূত্রাদি ত্যাগ নিষিদ্ধ। (শ্রীহরিভক্তি বিলাস ৩/১৫৭-১৬৩)।

প্রশ্ন : ১৬৯০ ॥ জড়জগৎ থেকে মুক্তি লাভের জন্য কি কি পথ আছে। এদের মধ্যে কোন্‌টি উত্তম?

উত্তর : জড়জগৎ থেকে মুক্তি লাভের দুইটি পথ আছে : জ্ঞান ও ভক্তি। জ্ঞান পথ কষ্টসাধ্য এবং বহুদিন পরে সাধক নিজের স্বরূপ বুঝতে পারেন। ভক্তি পথ সুগম, সুখকর এবং তাড়াতাড়ি ভগবদ্‌ প্রাপ্তিজনক। কাজেই ভক্তি পথই মুক্তির সহজ উপায়।

প্রশ্ন : ১৬৯১ ॥ নন্দ মহারাজের পত্নী যশোদা সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : অতি সংক্ষেপে বলা হল : শ্রীকৃষ্ণের মাতা, বর্ণ-শ্যাম, বস্ত্র-ইন্দ্রের ধনুর ন্যায়। দেহ কিছুটা স্থূল এবং দীর্ঘ, কেশ-নীলবর্ণ, শ্রীরাধার মা কীর্ত্তিদা এঁর শ্রেষ্ঠ প্রাণসখী। তিঁনি গোকুলে গোকুলাধীশ গৃহিনী। দেবকী, দেবকী সখী, গোপেশ্বরী, গোষ্ঠরাজ্ঞী, কৃষ্ণমাতা ইত্যাদি নামেও অভিহিত হন।

প্রশ্ন : ১৬৯২ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ যাদবকুলে যদুবংশে আবির্ভূত হন। প্রশ্ন হল এই যাদবকুল বা বংশধারা কিরূপ ছিল?

উত্তর : যযাতি রাজার বড় ছেলের নাম ছিল যদু। এই যদু থেকে যাদবকুলের বা বংশের উৎপত্তি হয়। যদু বংশের শাখাসমূহ হল : সাত্ত্বত, ভোজ, যদু, বৃষ্ণি, অন্ধক, মধু, দাশার্হ এবং কুকুর। (ভাগবত ১০/৪৫/১৫)।

প্রশ্ন : ১৬৯৩ ॥ যুগধর্ম বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : যুগের উপযোগী যে ভজন তাকেই সংক্ষেপে যুগধর্ম বলা যায়। যেমন সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতায় যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্যা এবং কলিযুগে নাম-সংকীর্তন ইত্যাদি হল যুগধর্ম।

প্রশ্ন : ১৬৯৪ ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় (১৫/১১) যোহসি সোহসি—এই শব্দ দুটি আছে। এর দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : এর দ্বারা তুমি যে হও, সে হও, তোমাকে নমস্কার—এই কথা বুঝানো হয়েছে। পূর্ণ শ্লোকটি হল : রাধে কৃষ্ণ, রমে বিষ্ণো, সীতে রাম, শিবে শিব। যাসি সাসি নমো নিত্যং যোহসি সোহসি নমোহস্তুতে।

প্রশ্ন : ১৬৯৫ ॥ রঙ্গনাথের মূর্ত্তি ভগবানের কোন্‌ রূপ?

উত্তর : দক্ষিন ভারতে কাবেরী নদীর তীরে শ্রীরঙ্গনাথজীর একটি মন্দির আছে। এই মন্দিরের অধিদেবতা হলেন শেষশায়ী শ্রীবিষ্ণুমূর্ত্তি।

প্রশ্ন : ১৬৯৬ ॥ শ্রীজগন্নাথদেবের বলগণ্ডি ভোগ কি?

উত্তর : রথযাত্রার সময় শ্রীমন্দির থেকে গুণ্ডিচা মন্দিরে যাওয়ার অর্ধেক পথে বলগণ্ডি নামক স্থানে রথ আসলে জগন্নাথ, বলদেব এবং সুভদ্রাদেবীর শান্তির জন্য পঞ্চামৃত এবং সুবাসিত জল দ্বারা দর্পনে অভিষেক, সুগন্ধি চন্দন ও কর্পূর দ্বারা সর্বাঙ্গে লেপন, চামর ও পাখা দ্বারা বাতাস, সুমধুর পেয়দ্রব্য, মিষ্টান্ন, বিভিন্ন ধরনের সুস্বাদুপর শীতল জল এবং তাম্বুল অর্পন করা হয়। একে বলগণ্ডি ভোগ বলে।

প্রশ্ন : ১৬৯৭ ॥ মানুষের মধ্যেই নাকি রাক্ষসও আছে? তবে কাদেরকে রাক্ষস বলা যায়?

উত্তর : সাধারণ অর্থে রাক্ষস বলতে নরখাদক বলা হয়। ভক্তির সামৃত সিন্ধু গ্রন্থ অনুযায়ী হরিপূজাবিহীন, বেদ বিদ্বেষী এবং গো-ব্রাহ্মণ হিংসুক ব্যক্তিকে নর-রাক্ষস বলা যায়।

প্রশ্ন : ১৬৯৮ ॥ সনাতন ধর্মে কত ধরনের বিবাহ আছে এবং সেগুলো কি কি?

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল। সনাতন ধর্মে আট রকমের বিবাহ আছে।

১. ব্রাহ্ম বিবাহ : বিদ্যান ও চরিত্রবান বরকে স্বেচ্ছায় কন্যাদান।
২. দৈব বিবাহ : যজ্ঞে ঋত্বিককে অলঙ্কার দ্বারা সজ্জিত কন্যাদান।
৩. আর্য বিবাহ : বর থেকে গোমিথুন লইয়া যথাধর্ম কন্যাদান।
৪. প্রজাপত্য বিবাহ : উভয়ই সমান ধর্ম আচরণ কর—এই বলে কন্যা দান।
৫. আসুর বিবাহ : জ্ঞাতিগণকে এবং কন্যাকে ধনসহ কন্যা দান।
৬. গান্ধর্ব বিবাহ : কন্যা ও বরের পরস্পর সম্মতিতে বিবাহ।

৭. **রাক্ষস বিবাহ :** আক্রমন, জয় এবং ভেদপূর্বক ক্রন্দনরত কন্যার গ্রহণ।

৮. **পিশাচ বিবাহ :** গোপনে ঘুমন্ত বা মত্তা কন্যাকে ছলে-বলে গ্রহণ করে বিবাহ।

প্রশ্ন : ১৬৯৯ ॥ রাগাত্মিকা ভক্তি কাকে বলে?

উত্তর : ইষ্টবস্তুতে (যেমন শ্রীকৃষ্ণে) যে প্রেমময় তৃষ্ণা তাকে রাগ বলে। এই রাগময়ী ভক্তিকেই রাগাত্মিকা ভক্তি বলে। শ্রীবৃন্দাবনের গোপীগনেরই কৃষ্ণে এরূপ ভক্তি ছিল।

প্রশ্ন : ১৭০০ ॥ রাগানুগা ভক্তি কাকে বলে?

উত্তর : ব্রজবাসীগণের শ্রীকৃষ্ণে যেভাব সেইরূপ ভাব পাওয়ার জন্য উপায়কে রাগানুগা ভক্তি বলে। এক্ষেত্রে কোন গোপীর অনুগত হয়ে ভগবানের সেবা করতে হয়।

প্রশ্ন : ১৭০১ ॥ মহাপ্রভুর সাথে নাকি ত্রেতাযুগের বিভীষণের দেখা হয়েছিল? কোন উপলক্ষ্যে?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য মঙ্গল (গৌড়ীয় সংস্করণ শেষ ৪/৪) গ্রন্থ থেকে দেখা যায় এক সময় একজন দরিদ্র ব্রাক্ষণ অর্থ পাওয়ার আশায় শ্রীজগন্নাথ দেবের মন্দিরের দ্বারে সাতদিন উপবাস করে জীবন ত্যাগের জন্য সমুদ্রকূলে যান। সেখানে দেখেন যে এক বিশাল আকারের মানুষ সমুদ্রের উপর দিয়ে হাটিয়া কূলে এসে সাধারণ মানুষের আকার ধারণ করলেন। ব্রাক্ষণ তাঁকে দেখে জগন্নাথদেব মনে করে পশ্চাৎগামী হলেন এবং অনেক অনুনয়ের পর আনতে পারলেন যে তিনি বিভীষণ। দুই জনেই মহাপ্রভুর দর্শনে গেলেন। মহাপ্রভু ব্রাক্ষণকে প্রচুর ধন দিতে আদেশ দিয়ে বিভীষণকে কৃপা করে বিদায় দিলেন।

প্রশ্ন : ১৭০২ ॥ রামনবনীর উপবাস ভক্তরা করে থাকেন। এ সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

উত্তর : চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের নবমী তিথিতে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র আবির্ভূত হন। ঐ দিন ব্রত-উপবাস বিহিত। ঐদিন মধ্যাহ্নকালে পুনর্বসু-নক্ষত্র যোগ হলে ঐ তিথির ফল বেশী হয়। তবে অষ্টমীবিদ্ধা

নবমী ত্যাগ করতে হবে এবং দশমী দিন ব্রত করতে হবে। আর পারন কিন্তু দশমীর মধ্যেই করতে হবে।

যদি দশমীতে পারন অসম্ভব হয়—অর্থাৎ তিথি ক্ষয়ে অষ্টমীবিদ্ধা নবমী হওয়ায় শুদ্ধা দশমীতেই উপবাস করতে হয় এবং পরদিন শুদ্ধা একাদশীতে ব্রত আচরণ করতে হয় তবে কিন্তু অষ্টমী বিদ্ধা নবমীতেই শ্রীরাম নবনীর ব্রত হবে। (শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ১৪/২৪১-৩০২)।

প্রশ্ন : ১৭০৩ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলার কোন ইঙ্গিত বা ব্যাখ্যা কি আমাদের কোন বেদে রয়েছে?

উত্তর : শ্রীমৎ নীলকণ্ঠ সূরি (বিভিন্ন শাস্ত্রের একজন বিখ্যাত টীকাকার) মন্ত্র ভাগবতে সুপ্রাচীন ঋগ্‌বেদের (১/১/১৯, ২/৩/১৬, ৩/২/১২, ৩/৩/১৪, ১৫) মন্ত্রসমূহ থেকে বংশীধ্বনি, ব্রজ রমনীসহ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসাদি এবং রাসলীলা ইত্যাদির সুন্দর চিত্র অংকন করে প্রতিপন্ন করেছেন যে ঋগ্‌বেদেও রাসলীলার সংকেত রয়েছে। তার লিখিত **হরিবংশ-টীকাতে** (২/২১/২৫) ঋগ্‌বেদের (৩/৫৫/১৪) মন্ত্র উদ্ধার করে রাসনৃত্যের অভিনব ব্যাখ্যা দেয়া হয়েছে। ঋগ্‌বেদের এই মন্ত্রটি হল—

"পদ্যাবস্তে পুরুরূপা বপূংষ্যূর্দ্ধা তস্থৌ এ্যবিং রেরিথানা।
ঋতস্য সদ্ম বিচরামি বিদ্বান্মহদ্দেবানাত্ম সুরত্বমেকম্ ॥

এছাড়াও ঋক্ (১/৩০/৫), সাম (১৬০০) এবং অথর্ব (২০/৪৫/২) বেদে স্তোত্রং রাধানাৎ পতে ইত্যাদি মন্ত্রে রাধাপতি শব্দের উল্লেখ দেখা যায়।

প্রশ্ন : ১৭০৪ ॥ শ্রীল শুকদেব গোস্বামী রাসলীলার বর্ণনা ভাগবতে করলেও শ্রীরাধার নাম সরাসরি উল্লেখ করেন নাই কেন?

উত্তর : শ্রীল সনাতন গোস্বামীপাদ তাঁর বৃহৎ ভাগবতামৃত গ্রন্থে (১/৭/১৫৭-৫৮) এর ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেন, গোপীদের নাম স্মরণেও শ্রী শুকদেবের অন্তরে মহাভাবিনী গোপীগণের মহাবিরহ জ্বালার স্পর্শে পরম-মহাবৈকল্য উপস্থিত হয়ে ভাগবত বর্ণনাই স্থগিত

হয়ে যেত। এই কারণে শ্রীল শুকদেব শ্রীরাধা এবং অনেক গোপীর নাম সরাসরি উল্লেখ করেন নাই।

প্রশ্ন : ১৭০৫ ॥ রাসলীলা কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : রাস দুই প্রকার : নিত্যরাস এবং মহারাস। আদিপুরানে নিত্যরাস এবং শ্রীমদ্ ভাগবতে মহারাসের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। আবার শরৎ এবং বসন্তকাল ভেদেও রাস দুই রকম। শ্রীমদ্ ভাগবতে শরৎকালীন রাস এবং শ্রী গীতগোবিন্দ গ্রন্থে বসন্তকালীন রাসের বর্ণনা আছে। এছাড়া **পদকল্পতরু** এবং **পদামৃত সমুদ্র** গ্রন্থে সব ধরনের রাসের পদাবলী আছে।

প্রশ্ন : ১৭০৬ ॥ নবগ্রহের একটি গ্রহ হল অসুর রাহু। তার পরিচয় কি?

উত্তর : অসুররাজ হিরন্যকশিপুর কন্যা সিংহিকার গর্ভে জাত বিপ্রচিত্তের পুত্র। রাহু হল নবগ্রহের মধ্যে অষ্টম গ্রহ। (ভাগবত ৬/৬/৩৭)।

প্রশ্ন : ১৭০৭ ॥ শিবের এক নাম রুদ্র। তিনি কিভাবে আবির্ভূত হন?

উত্তর : রুদ্র হলেন শিবের এক বিশেষ মূর্ত্তি। ব্রহ্মা তাঁর মানস পুত্র সনৎ, সনাতন, সনন্দন এবং সনৎ কুমারকে প্রজা সৃষ্টির আদেশ দিলে তাঁরা এই আদেশ না মানায় ব্রহ্মার ভীষণ ক্রোধ উৎপন্ন হয়। সম্বরণ করতে চেষ্টা করলেও ব্রহ্মার দুই ভ্রূ থেকে নীললোহিত রঙের এক কুমার নির্গত হয়। এই কুমারই দেবগণের পূর্বজ এবং অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। রোদন বা কান্না করায় তাঁর নাম হয় রুদ্র।

প্রশ্ন : ১৭০৮ ॥ একাদশ রুদ্রের কথা শাস্ত্রে দেখি। এঁদের স্ত্রী কারা ছিলেন এবং নাম কি কি?

উত্তর : একাদশ রুদ্রানী হলেন : ধী, ধৃতি, রসলা, উমা, নিযুৎ, সর্পি, হলা, অম্বিকা, ইরাবতী, স্বধা এবং দীক্ষা।

প্রশ্ন : ১৭০৯ ॥ ভগবান শ্রীপরশুরামের পিতা এবং মাতার নাম কি ছিল?

উত্তর : শ্রীপরশুরামের পিতা ছিলেন জমদগ্নি নামক এক মহাঋষি। ইক্ষাকুবংশের রাজা রেনুর কন্যা রেনুকা ছিলেন তাঁর মাতা।

প্রশ্ন : ১৭১০ ॥ ভাগবতের প্রবক্তা শ্রীল সূত গোস্বামীর পিতা কে ছিলেন?

উত্তর : সূত গোস্বামীর পিতার নাম রোমহর্ষন। শ্রীল ব্যাসদেবের কাছ থেকে তিনি ইতিহাস এবং পুরানশাস্ত্র পাঠ করেন। শ্রীবলদেব এক অপরাধের জন্য একে নৈমিষারন্যে নিহত করেছিলেন। রোমহর্ষণ বৃদ্ধ-সূত হিসাবেও পরিচিত ছিলেন।

প্রশ্ন : ১৭১১ ॥ শ্রীগৌরহরির প্রথম পত্নী ছিলেন লক্ষীদেবী। নারায়নের পত্নী লক্ষীদেবীই কি কলিকালে গৌরহরির পত্নী লক্ষী হিসাবে আবির্ভূতা হন?

উত্তর : না। শ্রীগৌরহরির প্রথমা পত্নী লক্ষীদেবী পূর্ব পূর্ব লীলার জানকী (সীতা) ও রুক্মিনী এবং শ্রীশক্তি ছিলেন। (**শ্রীগৌর গনোদ্দেশদিপীকা ৪৫-৪৬**)।

প্রশ্ন : ১৭১২ ॥ রাবনের লঙ্কাপুরী কি আজকের শ্রীলংকা ছিল?

উত্তর : সাধারণ লোকেরা তাই মনে করেন। লঙ্কা ছিল জম্মুদ্বীপের অধীনের একটি বিশেষ উপদ্বীপ (**ভাগবত ৫/১৯/২৯**)। এটি ছিল রাক্ষসরাজ রাবনের রাজধানী। মার্কণ্ডেয় পুবান (৫৮), মহাভারত সভাপর্ব (৩০), বনপর্ব (৫১), বৃহৎসংহিতা (১৪) ইত্যাদির মতে বর্তমানের শ্রীলঙ্কা থেকে রাবনের শ্রীলঙ্কা ভিন্ন। বায়ুপুরানের (৪৮) ভূবন-বিন্যাস প্রসঙ্গে জম্মুদ্বীপের চারপাশে যে ছয়টি দ্বীপের কথা উল্লেখ আছে, মলয়দ্বীপ তাদের মধ্যে অন্যতম। ভাস্করাচার্য তার গোলাধ্যায়ের বিবরণে লঙ্কার অবস্থান বিষুব রেখার সন্নিহিত প্রদেশে এবং অবন্তীর প্রায় সম-দ্রাঘিমান্তর (longitnde) বলেছেন। এই কারণে V. H. Vader উক্ত মলয়দ্বীপস্থ (আধুনিক মালদ্বীপ) ত্রিকূট পর্বতের কোনও সুরম্য নিচ দেশে লঙ্কাপুরীর অবস্থান নির্ণয় করেছেন। প্রাকৃতিক

কারণে এখন এই লঙ্কা সমুদ্রে বিলীন হয়ে গিয়েছে। ভূতত্ত্বও তাই সমর্থন করে। [উৎস : শ্রী শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধান ১ম খণ্ড পৃষ্ঠা ৬৬৭]

প্রশ্ন : ১৭১৩ ॥ লিঙ্গ শরীর কি?

উত্তর : কারণভূত, সুক্ষ্মতম, ইন্দ্রিয়ের অতীত এবং অব্যক্ত দেহকে লিঙ্গশরীর বলে। এর উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় নাই, সব সময়ই একরূপ। স্থূল বা পঞ্চভূতের দেহ (মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ দ্বারা গঠিত দেহ) ধ্বংস হলে জীব (আত্মা) যে দেহ অবলম্বন করে লোকান্তরে যায় তাই হল লিঙ্গ শরীর। এই শরীরে অসংখ্য কর্মসংস্কার নিহিত থাকে। আগের কর্মসংস্কার নিয়ে জীব স্থূল দেহে প্রবেশ করে। স্থূল দেহের উৎপত্তির আগেও জীবের লিঙ্গদেহ থাকে। জীব যতদিন মায়ার অধিকারে যাকে—অর্থাৎ মায়ায় আবদ্ধ থাকে, ততদিন লিঙ্গ শরীরে আবদ্ধ থাকে।

প্রশ্ন : ১৭১৪ ॥ ভগবানের লীলা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : সুচারু, খেলাধূলা, নৃত্য, বেনু (বাশি) বাজানো, গো-দোহন, গোবর্দ্ধনধারণ, গো-আহ্বাহন, গমনা-গমন ইত্যাদিকে রসশাস্ত্রে ভগবানের লীলা বলা হয়। প্রকট এবং অপ্রকট ভেদে এই লীলা দুই ধরনের হয়। জড়জগতে দেখা লীলাই প্রকট লীলা। আর সব লীলাই অপ্রকট—অর্থাৎ দেখা যায় না।

প্রশ্ন : ১৭১৫ ॥ লীলাশুক বিল্বমঙ্গল ঠাকুর সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : অতি সংক্ষেপে বলা হল : আসল নাম শ্রী বিল্বমঙ্গল। চিন্তামনি নামক এক বেশ্যার সঙ্গে ইনি অধোগতির চরম সীমায় পৌছে একসময় ঐ বেশ্যার উপদেশে বৈরাগ্যময় ভক্তিজীবন যাপন করেন। বৃন্দাবনে কৃষ্ণ দর্শনের জন্য যাওয়ার সময় তাঁর মুখ থেকে স্বতঃস্ফুর্তভাবে বহু কবিতা উৎকীর্ণ হতে থাকে। তার সঙ্গীগণ ঐসব কবিতাগুলি একত্রিত করেন এবং একসময় **শ্রীকৃষ্ণ কর্ণামৃত** নামক এক অতি উজ্জ্বল রসময় গ্রন্থ সেগুলোর মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এইসব কবিতা শুনে খুবই আনন্দিত হতেন।

প্রশ্ন : ১৭১৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বংশী কিরূপ জানতে চাই।

উত্তর : নয়টি ছিদ্র যুক্ত সতের (১৭) আঙ্গুল বিশিষ্ট বাঁশীকেই ভগবানের বংশী বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭১৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বংশুলী কিরূপ?

উত্তর : মুখ ছিদ্রে এবং স্বর ছিদ্রে চৌদ্দ আঙ্গুল ব্যবধান থাকলে সেই বংশীর বা বাঁশীর নাম বংশুলী বা আনন্দিনী। বাঁশ দ্বারা এরূপ বাঁশী নির্মিত।

প্রশ্ন : ১৭১৮ ॥ শ্রী ভগবানের বরাহ অবতার সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল : শ্রী ভগবানের তৃতীয় অবতার শ্রী বরাহ রূপে প্রকাশিত হন। ব্রাহ্মকল্পে ইঁনি দুইবার আবির্ভূত হন। প্রথমত : স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে ব্রহ্মার নাকের ছিদ্র থেকে এবং দ্বিতীয়ত ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে হিরন্যাক্ষ অসুরকে বধ করার জন্য জল থেকে আবির্ভূত হন। তিঁনি কখনো চতুষ্পাদ (চার পা বিশিষ্ট) কখনো নৃ-বরাহ, কখনো মেঘ-শ্যামল, কখনো বা সাদা মূর্ত্তিতে আবির্ভূত বা প্রকট হন।

প্রশ্ন : ১৭১৯ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ঠাকুরমার নাম কি?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের ঠাকুমার নাম বরীয়সী। তিনি পর্জন্য গোপের স্ত্রী ছিলেন। এর বর্ন কুসম্ভ ফুলের ন্যায়, বস্ত্র-হলুদ বর্ণের, আকারে খাটো এবং কেশ বা চুল-দুধের মত সাদাবর্ণের।

প্রশ্ন : ১৭২০ ॥ বর্ণ শঙ্কর কাদেরকে বলা হয় বা যায়?

উত্তর : মাতা এবং পিতা ভিন্ন বর্ণের হলে তাদের থেকে উৎপন্ন সন্তানকে বর্ণ শঙ্কর বলা হয়। যেমন পিতা ব্রাহ্মণ অথচ স্ত্রী বৈশ্য। এদের মিলনে যে পুত্র অথবা কন্যা সন্তান হবে তাকে বর্ণ শঙ্কর বলা হবে।

প্রশ্ন : ১৭২১ ॥ ভগবানকে গোপীজনবল্লভ বলা হয় কেন?

উত্তর : একমতে গোপী (প্রকৃতি) এবং জন (তত্ত্বসমূহ) এই উভয়ের ব্যাপক হওয়ায় আশ্রয় এবং কারণ বলিয়া যিনি ঈশ্বর, তিনি গোপীজন বল্লভ। শ্রীভগবানে এই উভয় বৈশিষ্ট্য থাকায় তাকে

গোপীজন বল্লভ বলা হয়। আবার অন্যমতে বহু নিত্যসিদ্ধ গোপীদের পতি হওয়ায় কৃষ্ণকে গোপীজন বল্লভ বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭২২ ॥ শ্রীকৃষ্ণের পিতা বসুদেব সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল। যদুবংশের রাজা শূরের পুত্র ছিলেন বসুদেব। তিনি নন্দ মহারাজের বন্ধু ছিলেন। এঁর অন্য নাম আনক দুন্দুভি। পূর্বজন্মে তিনি দ্রোন নামক বসু ছিলেন। পত্নীগণের নাম- দেবকী, রোহিনী, পৌরবী, ভদ্রা, মদিরা, রোচনা, ইলা প্রমুখ।

প্রশ্ন : ১৭২৩ ॥ প্রহ্লাদ মহারাজ পূর্বজন্মে কে ছিলেন?

উত্তর : পূর্বজন্মে প্রহ্লাদ মহারাজ ছিলেন বসুশর্মা নামক এক সদাচারী এবং বেদ-বিচক্ষণ ব্রাহ্মণের পুত্র। তখন তাঁর নাম ছিল বসুদেব। এক সময় তিনি বেশ্যাশক্ত হয়ে পড়েন। একদিন শ্রী নৃসিংহ চতুর্দশী তিথিতে এই বসুদেব অজ্ঞাতসারে উপবাস করেছিলেন এবং রাত্রিতে ঐ বেশ্যার সাথে কলহ (ঝগড়া) করতে করতে রাত্রি জাগরণ করেন। এর ফলে তিনি প্রহ্লাদ হয়ে হরি ভক্ত রূপে জন্ম গ্রহণ করেন।

প্রশ্ন : ১৭২৪ ॥ বানাসুরের মেয়ে উষার সাথে নাকি ভগবান কৃষ্ণের পুত্র অনিরুদ্ধের বিবাহ হয়। বানাসুরের পরিচয় এবং এই বিয়ে সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : বানাসুর ছিলেন প্রহ্লাদ মহারাজের পৌত্র (নাতি) এবং বলি মহারাজের বড় পুত্র। শিব ভক্ত। শিবের তপস্যায় এক হাজার বাহু লাভ করে ইন্দ্রসহ অপরাপর দেবতাকে যুদ্ধে পরাজিত করে ভৃত্যরূপে (চাকর হিসাবে) নিযুক্ত করেছিল। বানের মেয়ে উষা নিজের সখী চিত্র লেখার মাধ্যমে যোগবলে কৃষ্ণের ছেলে অনিরুদ্ধকে এনে এক সময় তাঁকে বিবাহ করে। এই সংবাদ পেয়ে বানাসুর অনিরুদ্ধকে কারাগারে রেখে দেয়। নারদের কাছে এই সংবাদ পেয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ আরম্ভ করলে শিবের সাথে তাঁর যুদ্ধ হয়। কৃষ্ণ বানের প্রায় এক হাজার হাত যখন কেটে ফেলেন তখন শিব স্তব করে কৃষ্ণকে সন্তুষ্ট করেন এবং বানের চারটি হাত রেখে দেয়ার জন্য প্রার্থনা করেন। ভগবান চার হাত রেখে বানের সব হাত কেটে ফেলেন। পরে উষা ও অনিরুদ্ধকে সাথে নিয়ে দ্বারকায় আসেন।

প্রশ্ন : ১৭২৫ ॥ শ্রীরাধার সখী ললিতাকে বামা প্রখরা বলা হয় কেন?

উত্তর : যে সখী নিজের মান বিষয়ে সচেতন, মান (সম্মান) না দিলে রাগ করেন, প্রয়োজনে কঠোর ভাষা প্রয়োগ করেন তিনিই বামা নায়িকা। ললিতা সখীর এইসব বৈশিষ্ট্য ছিল বলে তাকে বামা প্রখরা বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭২৬ ॥ ভগবানের এক নাম বাসুদেব। এর কারণ কি?

উত্তর : পরমাত্মারূপী ভগবানে সৃষ্ট যাবতীয় পদার্থ অবস্থান করে এবং তিঁনিও সর্বভূতে অবস্থান করেন বলে তাঁর এক নাম বাসুদেব **(বিষ্ণু পুরান ৬/৫/৮০)**। আবার বসন ও বাসন থেকে বাসু শব্দ এবং দ্যোতন থেকে দেব-শব্দ সাধিত হয়। **বাসুই দেব**-এরূপ কর্ম ধারণের অর্থ—যিনি সর্বভূতের অন্তরে বাস করেন এবং সর্বভূত যাঁহাতে বাস করে, যিনি দেব অর্থাৎ জগতের ধাতা এবং বিধাতা, সেই প্রভুই বাসুদেব **(বিষ্ণু পুরান ৬/৫/৮২)**।

প্রশ্ন : ১৭২৭ ॥ সন্ন্যাসীগণের ক্ষৌরকাজের (মাথা মুণ্ডন) বিষয়ে কোন বিধি আছে কি? তারা কি যখন-তখন এই কাজ করতে পারেন?

উত্তর : একদণ্ডী সন্ন্যাসীগণের দুই মাস পর পর পূর্ণিমা তিথিতে ক্ষৌর কাজ বিহিত। সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ে ঋতুভেদে ক্ষৌর নাম নিম্নরূপ—

ঋতু	পূর্ণিমা	ক্ষৌর নাম
গ্রীষ্ম	বৈশাখী	আচার্য
বর্ষা	আষাঢ়ী	ব্যাস
শরৎ	ভাদ্রী	বিশ্বরূপ
হেমন্ত	কার্ত্তিকী	জ্যোতিরূপ
শীত	পৌষী	ব্রহ্ম
বসন্ত	ফাল্গুনী	দত্তাত্রেয়

প্রশ্ন : ১৭২৮ ॥ বৃন্দাদেবী সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল। শ্রীকৃষ্ণের দূতী (সংবাদ আনা নেয়ার পাত্রী), কুঞ্জ-সংস্কারে অভিজ্ঞা, বৃক্ষ পরিচর্যায় পণ্ডিতা এবং স্থাবর ও জঙ্গম এঁর অধীনে। বৃন্দাদেবীর বর্ণ তপ্তকাঞ্চনের (স্বর্নের) ন্যায়, বস্ত্র-নীলবর্ণ, মুক্তার মালা এবং পুষ্পদামে বিরাজিতা। পিতা-চন্দ্রভানু, মাতা-ফুল্লরা, স্বামী-মহীপাল। ইঁনি সবসময় বৃন্দাবনে বাস করেন। রাধাকৃষ্ণের যুগল মিলন করাই তাঁর অভিপ্রেত সেবা।

প্রশ্ন : ১৭২৯ ॥ শ্রীরাধার পিতা বৃষভানু সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল : মহীভানুর পুত্র, শ্রীরাধার পিতা। পত্নীর নাম-কীর্ত্তিদা। ভাই-রত্নভানু, সুভানু, এবং ভানু। বোনের নাম-ভানু মুদ্রা। কন্যা-শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরী এবং পুত্রের নাম-শ্রীদাম।

প্রশ্ন : ১৭৩০ ॥ বৈজয়ন্তী মালা কি যা শ্রীকৃষ্ণের গলায় থাকে?

উত্তর : পাঁচ ধরনের বর্ণের ফুল দ্বারা তৈরি আজানু লম্বিত (হাটুর নীচ পর্যন্ত লম্বা) মালাকে বৈজয়ন্তী মালা বলে।

প্রশ্ন : ১৭৩১ ॥ পঞ্চজন নামক অসুরের অস্থি থেকে নাকি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের শঙ্খ নির্মিত হয়। এই পঞ্চজন অসুর সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : পঞ্চজন ছিল কংসের পক্ষের শঙ্খাসুর। এক কাহিনী অনুযায়ী পূর্বজন্মে তিনি একজন ভগবৎ পার্ষদ ছিলেন। ঐ জন্মে তিনি ভগবানের অর্চ্চনা করার সময় খুব জোরে শঙ্খ-নাদ করতেন। একদিন ঐ শব্দে একজন ব্রাহ্মণীর গর্ভপাত হয়। তখন তার স্বামী শঙ্খকে অসুর হওয়ার জন্য অভিশাপ দেন। ফলে তিনি পাঞ্চজন্য নামক অসুর রূপে জন্ম নিয়ে সমুদ্রে আশ্রয় নেন। একসময় এই অসুর সান্দিপনি মুনির সন্তানকে গ্রাস করায় শ্রীকৃষ্ণ গুরুপুত্রকে উদ্ধার করার জন্য এই অসুরকে বধ করেন।

উল্লেখ্য যে উপরোক্ত কারণে কোন কোন বৈষ্ণব দেহে শঙ্খ মুদ্রা এককভাবে ধারণ না করে শঙ্খ এবং চক্র মিলিতভাবে ধারণ করেন। **(ভাগবত ১০/৩৭/১৬ এবং শ্রী হরিভক্তি বিলাস ৪/৩০৩ টীকা)।**

প্রশ্ন : ১৭৩২ ॥ পাণ্ডব বংশে পরীক্ষিৎ কি সর্বশেষ রাজা ছিলেন?

উত্তর : না। পরীক্ষীৎ এর পুত্র ছিলেন জনমেজয়। তিনি ব্যাস দেবের শিষ্য বৈশম্পায়ন মুনি থেকে মহাভারত শ্রবণ করেছিলেন। তক্ষক সাপের দংশনে পরীক্ষীৎ মৃত্যুবরণ করায় জনমেজয় সাপবংশ ধ্বংস করার জন্য সর্পনিধন যজ্ঞ করেছিলেন। পরে অবশ্য আস্তিক মুনির কৃপায় সর্পগণ রেহাই পায়।

জনমেজয় এর পুত্র ছিলেন শতানীক। তিনি ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য থেকে ত্রয়ী বিদ্যা ও ক্রিয়াজ্ঞান, কৃপাচার্য্য থেকে অস্ত্রবিদ্যা এবং শৌনক মুনি থেকে আত্মজ্ঞান লাভ করেন **(ভাগবত ৯/২২/৩৮)।**

প্রশ্ন : ১৭৩৩ ॥ রাজা পরীক্ষিতকে কোন্ মুনি অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং কেন?

উত্তর : রাজা পরীক্ষিতকে ৭ দিনের মধ্যে তক্ষক সাপে দংশন করবে—এই শাপ শৃঙ্গি নামক এক বালক ঋষিপুত্র দিয়েছিলেন। একদিন পরীক্ষিত মহারাজ হরিন শিকারে গিয়ে গভীর বনে প্রবেশ করেন। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে তিনি শমীক নামক এক মুনির আশ্রমে গিয়ে সেখানে কিছু না পেয়ে রাগবশত এক মৃত সর্প মুনির গলায় স্থাপন করেন। এই সংবাদ জেনে এবং দেখে তখন শমিক মুনির বালক পুত্র শৃঙ্গী পরীক্ষিত মহারাজকে উপরোক্ত অভিশাপ দেন।

প্রশ্ন : ১৭৩৪ ॥ ভগবান কল্কিদেব কখন এবং কোথায় কার গৃহে আবির্ভূত হবেন?

উত্তর : কলিযুগের সময়সীমা হল ৪,৩২,০০০ বছর। এই যুগ শেষ হওয়ার ৫ হাজার বছর পূর্বে মুরাদাবাদ জেলার শম্ভলপুর নামক স্থানে বিষ্ণুযশা নামক এক ব্রাহ্মণের গৃহে ভগবান কল্কিদেব আবির্ভূত হবেন। ঐ সময় তিনি ম্লেচ্ছ এবং যবনদেরকে হত্যা করে আবার ধর্ম সংস্থাপন করে সত্যযুগের সূচনা করবেন।

প্রশ্ন : ১৭৩৫ ॥ রাত্রে অনেক দুঃস্বপ্ন দেখি। এ থেকে পরিত্রানের কোন শাস্ত্রীয় বিধি আছে কি?

উত্তর : রাত্রিকালে শোয়ার সময় শ্রীরাম, স্কন্দ (কার্তিক), শ্রী হনুমান, শ্রী গরুড়দেব এবং শ্রীবৃকোদর (ভীম)—এই পাঁচজনের নাম স্মরণ করলে দুঃস্বপ্ন দর্শন হয় না।

প্রশ্ন : ১৭৩৬ ॥ ভগবানের শর্য্যা কিভাবে নির্মিত হয়?

উত্তর : চম্পক ও অশোক ফুল দ্বারা খাট, মল্লী ফুল দ্বারা উপাধান (বালিশ) এবং নবমল্লিকা ফুল দ্বারা বিস্তৃর্ণ তুলী (তোষক) নির্মিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস শর্য্যা রচনা হয়। (রাধাকৃষ্ণ গনোদ্দেশ দিপীকা ২২৯)।

প্রশ্ন : ১৭৩৭ ॥ কেউ যদি শঠতা করে শ্রীহরিকে প্রণাম করে তবে তার কি কোন পাপ হবে না?

উত্তর :স্কন্দ পুরানে বলা হয়েছে যে, শঠতা করেও যদি কেউ বিষ্ণুকে প্রণাম করে, তবে তার শতজন্মের সঞ্চিত পাপ বিনষ্ট হবে।

প্রশ্ন : ১৭৩৮ ॥ শালগ্রাম শিলা কোথায় পাওয়া যায়?

উত্তর : ভারতের গণ্ডকী নদীতে উৎপন্ন শিলাকেই শালগ্রাম বলে। স্কন্দপুরান অনুযায়ী শালগ্রাম স্নিগ্ধ কৃষ্ণবর্ণ, নীল বর্ণ, বাঁকা (বক্র), অতিস্থূল, চিহ্ন হীন, কপিল বা লোহিত (লাল) বর্ণ, ভেক-আকৃতি (বেঙের মত), ভগ্ন, বহু চক্র যুক্ত, একচক্র, বৃহৎমুখ, বৃহৎচক্র, লগ্নচক্র, বদ্ধচক্র, ভগ্নচক্র, অথবা অধোবদন হয়ে থাকে। (শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ৫/২৯৬-২৯৮)।

প্রশ্ন : ১৭৩৯ ॥ স্ত্রীলোকেরা নাকি শালগ্রাম শিলার পুজার অধিকারী নয়?

উত্তর : বৈষ্ণব দীক্ষা গ্রহণ করলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র স্ত্রীলোক ইত্যাদি সকলেই শ্রী শালগ্রাম সেবার অধিকারী হন। কারণ ভগবৎ দীক্ষার প্রভাবে শূদ্র এবং স্ত্রীজাতি ব্রাহ্মণ সমতূল্য হয়—এই বিষয়ে শাস্ত্রে অনেক প্রমাণ আছে (শ্রী হরিভক্তি বিলাস ৫/৪৪৮-৪৫৫)।

প্রশ্ন : ১৭৪০ ॥ শিখণ্ডিকে কুরুবীর ভীষ্মের মৃত্যুর কারণ রূপে বলা হয়। প্রশ্ন হল এই শিখণ্ডি কে ছিলেন?

উত্তর : পাঞ্চাল নামক রাজ্যের রাজা দ্রুপদের সন্তান। ইনি প্রথমে কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করেন। অপুত্রক দ্রুপদ এঁর পুত্রোচিত জাতকর্ম সম্পাদন করেন। পরিণত বয়সে হিরণ্যবর্মা নামক এক রাজার কন্যার সাথে শিখণ্ডির বিবাহ হয়। কিন্তু পরে কন্যার কাছে প্রকৃত তথ্য জানার পর পাঞ্চালদেশ আক্রমণের উদ্যোগ নিলে শিখণ্ডি গৃহত্যাগ করে স্থূলকর্ণ নামক এক যক্ষের বনে প্রবেশ করেন। পরে ঐ যক্ষের বরে পুরুষত্ব লাভ করেন। পূর্বজন্মে শিখণ্ডি ছিলেন কাশীরাজ কন্যা অম্বা।

প্রশ্ন : ১৭৪১ ॥ ভগবান শ্রী রামচন্দ্রের পত্নী সীতা নাকি লাঙ্গলের অগ্রভাগ থেকে আবির্ভূতা হয়েছিলেন?

উত্তর : মিথিলার রাজা হ্রস্বরোমার পুত্র ছিলেন শীরধ্বজ। তিনি ভূমি কর্ষণের জন্য লাঙ্গল চালনা করলে তার অগ্রভাগ থেকে শ্রীসীতা আবির্ভূতা হয়েছিলেন (ভাগবত ৯/১৩/১৮)।

প্রশ্ন : ১৭৪২ ॥ ভাগবতের প্রবক্তা শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর আবির্ভাব কিভাবে হয়েছিল? এই সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাই।

উত্তর : ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরান মতে—শ্রীল ব্যাসদেব এক সময় জাবালীকন্যা বীটিকাকে বিবাহ করেন। এই স্ত্রীর গর্ভে শ্রীল শুকদেব আসেন। এগার বছর যাওয়ার পরও তিনি মাতৃগর্ভ থেকে বের না হওয়ায় বার বছরের সময় একদিন ব্যাসদেব বললেন, হে পুত্র, কেন তুমি নিজের মাকে কষ্ট দিতেছ—গর্ভ থেকে বের হও। শুকদেব উত্তর দিলেন—গর্ভ থেকে বাইরে আসলে আমাকে মায়া আক্রমণ করবে। তাই মায়ের গর্ভে থেকেই ধ্যান করছি। ব্যাস বললেন—মায়া তোমাকে প্রভাবিত করতে পারবে না, আমার কথা শুনে তুমি গর্ভ থেকে বের হয়ে আস, মাকে আর কষ্ট দিও না। তখন শুকদেব বললেন—আপনি যখন স্ত্রী এবং পুত্রে আসক্ত, তখন আপনার কথা প্রমাণরূপে গণ্য করতে পারি না। তখন ব্যাস বললেন—তুমি কার কথা প্রমাণ বলে বিচার করবে? শুকদেব বললেন—যিনি মায়াকে নিয়ন্ত্রণ করেন, মায়া যাঁর দাসী। তখন

ব্যাসদেব দ্বারকায় গিয়ে সব কথা বলে নিবেদন করায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্যাসের আশ্রমে আসেন। ভগবান শুকদেবকে আশ্বাস দিলেন যে গর্ভ থেকে বের হলে মায়াদেবী তাকে প্রভাবিত করতে পারবে না। শুকদেব তখন মায়ের গর্ভ থেকে বের হয়ে এসে ভগবানকে প্রণাম পূর্বক অনেক স্তব করেন। ভগবান ব্যাসদেবকে বললেন—তোমার পুত্র শুকবৎ বহু ভাল কথা বলছে, তাই এর নাম শুক হউক।

প্রশ্ন : ১৭৪৩ ॥ শূন্যবাদ কি?

উত্তর : বৌদ্ধদের কয়েকটি মতের মধ্যে একটি অন্যতম মত হল শূন্যবাদ। শূন্যই আত্মা—এরূপ কল্পনাকেই শূন্যবাদ বলা হয়। মাধ্যমিক বৌদ্ধমতে কোন কিছুরই অস্তিত্ব নেই, সবই শূন্য। স্বপ্নে দেখা বস্তু জাগ্রত অবস্থায় থাকে। আবার জাগ্রত অবস্থার বস্তু স্বপ্নে থাকে না। আবার সুষুপ্তিতে (গভীর ঘুমের মধ্যে) কোন কিছুরই উপলব্ধি থাকে না। কাজেই কোন বস্তুই সৎ নয়। এই হল শুন্যবাদের কথা।

প্রশ্ন : ১৭৪৪ ॥ শ্রী ভগবান এক সময় বরাহ রূপ ধারণ করেছিলেন। তাঁর আবির্ভাব স্থান কোথায় ছিল?

উত্তর : শ্রী বরাহ দেব শৌকরীপুরীতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। এখানে আদিবরাহ দেব প্রলয়জলে নিমগ্না পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ণ হন। বর্তমান নাম শূকরতল। একে বরাহ দর্শন হ্রদও বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭৪৫ ॥ শ্রীকৃষ্ণের সর্বোত্তম প্রিয় সখা শ্রীদাম সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : পিতা-বৃষভানু রাজা, মাতা-কীর্ত্তিদা, বোন-শ্রীরাধা ও অনঙ্গমঞ্জরী, শ্যামবর্ণ, পীতাম্বর, রত্নমালা-বিভূষিত, বয়স ষোল বছর, কিশোর এবং শ্রীকৃষ্ণের পীঠমর্দ সখা।

প্রশ্ন : ১৭৪৬ ॥ কোন কোন বৈষ্ণবের নামের আগে শ্রীপাদ শব্দটি ব্যবহার করতে দেখা যায়। এই শ্রীপাদ দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : কৃষ্ণ সে তোমার, কৃষ্ণ দিতে পার সেই শক্তি তোমার আছে—এরূপ কোন বৈষ্ণব মহাজনের নামের আগে শ্রীপাদ শব্দটি

ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ জীবকে যিনি কৃষ্ণের সন্ধান দিতে পারেন, কৃষ্ণকে দান করতে পারেন তিনিই এই শব্দ ধারণের উপযুক্ত। শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুকে শ্রীপাদ বলে সম্বোধন করেছিলেন। কাজেই যার তার নামের আগে এই শব্দটি প্রয়োগ করা ঠিক নয়।

প্রশ্ন : ১৭৪৭ ॥ শ্রীবিষ্ণুর কিছু পার্ষদের নাম জানতে চাই।

উত্তর : নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, প্রবল, বল, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, বিষ্ককসেন, গরুড়, জয়ন্ত, শ্রুতদেব, পুষ্পদন্ত ও সাত্বত প্রমুখ।

প্রশ্ন : ১৭৪৮ ॥ সমাধি কাকে বলে?

উত্তর : ইস্টদেবতায় মনের একাগ্রতাকে সমাধি বলা হয়। আবার সবকিছু ভুলে ব্রহ্মের অনুভব এবং ভগবৎ-অনুভূতিকেও সমাধি বলে। সমাধি দুই ধরনের হতে পারে : যুঞ্জান এবং যুক্ত। ভগবৎ তত্ত্বের ধারণা ও ধ্যানসহকারে চেষ্টায় যে সমাধি তাকে যুঞ্জান বলে। আর যোগিগণের হৃদয়ে সর্বদা যে ইস্টবস্তু স্ফুরিত থাকে তাকে যুক্ত সমাধি বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭৪৯ ॥ সৎ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বলতে কাদেরকে বুঝানো হয়?

উত্তর : শ্রীগুরু পরম্পরা সদুপদেশ অনুযায়ী যে সব বৈষ্ণব আচার-আচরণ এবং জীবনযাপন করেন তাদেরকেই সৎসম্প্রদায়ী বৈষ্ণব বলা যায়। অমর কোষ নামক গ্রন্থে এই সদুপদেশকে আম্নায় বলা হয়েছে। আদিগুরু ব্রহ্মা থেকে শিষ্য পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত ব্রহ্মবিদ্যাই আম্নায়। এই আম্নায় একমাত্র সৎ সম্প্রদায়েই লভ্য।

প্রশ্ন : ১৭৫০ ॥ ভগবানের সম্মোহনী বংশী বা বাঁশী কিরূপ?

উত্তর : বাঁশীর মুখ-ছিদ্র এবং স্বর-ছিদ্রের মধ্যে দশ আঙ্গুল ব্যবধান বা দূরত্ব থাকলে তাকে সম্মোহিনী বা মহানন্দা বংশী বলা হয়। এই বংশী বা বাঁশী মনিময়ী হয় (মনি দ্বারা নির্মিত)।

প্রশ্ন : ১৭৫১ ॥ শ্রীকৃষ্ণ ও বলরামের শিক্ষা গুরু সান্দীপনি মুনি সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : অতি সংক্ষেপে বলা হল। অবন্তীপুরে বসবাসরত কাশীজাত ব্রাহ্মণ। ইনি শ্রীকৃষ্ণের অন্যতম বিদুষক মধু মঙ্গলের পিতা।

তাঁর মাতার নাম পৌর্ণমাসী। পিতার নাম প্রবল এবং স্ত্রীর নাম সুমুখী। এঁর মৃত পুত্রকেই শ্রীকৃষ্ণ আনয়ন করে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ১৭৫২ ॥ সাযুজ্য মুক্তি কাকে বলে?

উত্তর : ব্রহ্ম অথবা পরমাত্মার সাথে একাত্নক বা লীন হয়ে যাওয়াকে সাযুজ্য মুক্তি বলে। এই মুক্তি দুই প্রকার। ব্রহ্ম সাযুজ্য এবং ঈশ্বর সাজুয্য। নির্বিশেষ ব্রহ্মে লীন হয়ে যাওয়াই ব্রহ্ম সাজুয্য এবং পরমাত্মার সাথে একত্ব প্রাপ্তিকে ঈশ্বর সাজুয্য বলা হয়। প্রথমটি থেকে দ্বিতীয়টি হেয়তর। সাজুয্য মুক্তির ক্ষেত্রে ভগবানকে সেবা করার কোন সুযোগ নাই। এই জন্য এরূপ জীব ভগবানের লীলার কোন আনন্দ পান না।

প্রশ্ন : ১৭৫৩ ॥ সৌর সম্প্রদায় কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : সনাতন ধর্মে অনেক সম্প্রদায় আছে। যেমন সৌর, গাণপত্য, শক্তি, শৈব, বৈষ্ণব ইত্যাদি। যারা সূর্যের উপাসক তাদেরকে সৌর সম্প্রদায়ী বলা হয়। এই মতে সূর্যই একমাত্র জগৎকর্ত্তা। তিনিই প্রকৃতি ও কাল দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করেন। তাঁর উপাসনায় জীবের দুঃখ দূর এবং মুক্তি লাভ হয়।

প্রশ্ন : ১৭৫৪ ॥ ইস্ট দেবতার স্নানের সময় কি পরিমাণ জল ব্যবহার করা উচিত?

উত্তর : দেবতার স্নানের সময় ১০০, বিভিন্ন অঙ্গ স্নানে ২৫ এবং মহা স্নানে ২০০ পল পরিমাণ জল ব্যবহার করা উচিত (শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ৬/১০০৯)। [১ পল = আটতোলার সমান]

প্রশ্ন : ১৭৫৫ ॥ ভগবৎ স্ফুর্ত্তি বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : চিত্তে ভগবানের সাক্ষাৎকারের ন্যায় অভিব্যক্তিকে ভগবৎ স্ফুর্ত্তি বলা হয়। আবার অনুরাগ পর্যন্ত দশায় মনে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবকেও স্ফুর্ত্তি বলে।

প্রশ্ন : ১৭৫৬ ॥ মানুষ ঘুমন্ত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে। ঐ সময় দেহ কি অবস্থায় থাকে?

উত্তর : যখন স্থুল দেহ (যে দেহ আমরা চক্ষুদ্বারা দর্শন করি এবং মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি ও আকাশ—এই পাঁচটি পদার্থ দ্বারা তৈরি) সুপ্ত

হলে সুক্ষ্মদেহ (মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার নিয়ে গঠিত দেহ) জাগ্রত থাকে এবং সংস্কার বিশিষ্ট অহংকারও বর্তমান থাকে তখনই মানুষ স্বপ্ন অবস্থায় উপনীত হয়।

প্রশ্ন : ১৭৫৭ ॥ শ্রী ভগবানের স্বাংশ প্রকাশ কাকে বলে?

উত্তর : নিজের রূপ থেকে অভিন্ন হয়ে বিলাস-অপেক্ষা কম শক্তির প্রকাশ মূর্ত্তিকে ভগবানের স্বাংশ প্রকাশ বলে। যেমন সঙ্কর্ষণ, পুরুষ অবতার, মৎস ইত্যাদি লীলা অবতার, মন্বন্তর অবতার এবং যুগ-অবতারগণ।

প্রশ্ন : ১৭৫৮ ॥ ধর্মীয় বইতে দেখি স্বাধ্যায় নামের একটি শব্দ। এই স্বাধ্যায় বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : স্বাধ্যায় বলতে বেদ অধ্যয়ন বা পাঠ করা বুঝায়। আবার কোন কোন গ্রন্থে এর দ্বারা মন্ত্রজপ এবং মন্ত্রের অর্থ সন্ধান করে জপ, বেদের সূক্ত ও স্তোত্র পাঠ, হরি সংকীর্তন, ইত্যাদি বুঝানো হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৭৫৯ ॥ স্বায়ম্ভুব মনু সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল। ব্রহ্মার এক দিবসে চৌদ্দ জন মনু রাজত্ব করেন। এদের মধ্যে প্রথম হলেন স্বায়ম্ভুব মনু। স্ত্রীর নাম-শতরূপা। দুই পুত্রের নাম-প্রিয়ব্রত ও উত্তানপাদ। স্বায়ম্ভুব মনু একসময় বিষয় ভোগে বিরক্ত হয়ে নিজের স্ত্রী শতরূপাকে নিয়ে বনে গমন করেন। সুনন্দা নদীর তীরে তিনি কঠোর তপস্যায় রত হন। ঐ সময় ক্ষুধার্ত অসুর এবং রাক্ষসগণ তাঁকে ভক্ষন করতে আসলে ভগবান শ্রীহরি দৈত্য ও রাক্ষসদেরকে বধ করেন।

প্রশ্ন : ১৭৬০ ॥ যজ্ঞের সময় ব্রাহ্মণরা স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করেন। এই স্বাহা দ্বারা কি বুঝায়?

উত্তর : দেবতার উদ্দেশ্যে দ্রব্যাদি ত্যাগ করাকে স্বাহা বলা হয় (ভাগবত ২/৭/৩৮)। আবার স্বাহা দ্বারা স্বায়ম্ভুব দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও প্রধান অগ্নির স্ত্রী বুঝায় (ভাগবত ৪/১/৬০)। তবে যজ্ঞের কথা বিবেচনা করলে আহুতি কাজ যা দ্বারা হয় তাকে স্বাহা বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭৬১ ॥ পঞ্জিকাতে দেখি নষ্ট চন্দ্র দেখা পাপ। নষ্টচন্দ্র আসলে কি?

উত্তর : ভাদ্র মাসের চতুর্থী তিথিতে চন্দ্র নিজের গুরু বৃহস্পতির পত্নীকে হরণ করেন বলে ঐ তিথিতে চন্দ্র দর্শন নিষিদ্ধ। নষ্ট চন্দ্র দর্শনে কলঙ্ক রটে বলিয়া প্রবাদ আছে। যদি কেউ ভুলক্রমে ঐ নষ্ট চন্দ্র দর্শন করে তবে পূর্ব বা উত্তর দিকে মুখ রেখে নীচের মন্ত্র জপ করে এক গণ্ডুষ জল পান করতে হবে।

মন্ত্র : **সিংহঃ প্রসেনমবধীৎ সিংহো জাম্ববতা হতঃ।**
সুকুমারক! মা রোদীস্তব হ্যেব স্যমন্তকঃ ॥

প্রশ্ন : ১৭৬২ ॥ ভগবানের শ্রীবৎস চিহ্ন কি?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের বক্ষে দক্ষিণাবর্ত্ত রোমাবলিকে শ্রীবৎস চিহ্ন বলে (চৈতন্য চরিতামৃত অন্ত্য ১৫/৭৪)। আবার একে লক্ষ্মীরেখাযুক্ত বক্ষঃ স্থলও বলা হয়। অন্যমতে কৌস্তভমনি, ভৃগুপদচিহ্ন এবং স্বর্ণরেখারূপা লক্ষ্মী হল শ্রীবৎস চিহ্ন।

প্রশ্ন : ১৭৬৩ ॥ শ্রীবিষ্ণুপদী কি?

উত্তর : শ্রীবিষ্ণুর পদ সংলগ্না তুলসীকে শ্রীবিষ্ণুপদী বলা হয়। অর্থাৎ ভগবানের পদে নিবেদিত তুলসীপত্রই বিষ্ণুপদী নামে অভিহিত।

প্রশ্ন : ১৭৬৪ ॥ শ্রীবৈষ্ণব কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : শ্রী সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবাচার্য শ্রী রামানুজের অনুসারীদেরকে শ্রীবৈষ্ণব বলা হয়। এঁরা বিশিষ্ট অদ্বৈতবাদী। শ্রী অর্থাৎ লক্ষ্মী থেকে এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তন হয়।

প্রশ্ন : ১৭৬৫ ॥ শ্রুতি শাস্ত্র কি?

উত্তর : বেদ এবং উপনিষদকে শ্রুতি শাস্ত্র বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭৬৬ ॥ শাস্ত্রে শ্বেতদ্বীপের উল্লেখ পাওয়া যায়। এটি কোথায় অবস্থিত?

উত্তর : গোকুলের বাইরের চারকোন বিশিষ্ট স্থান। চার কোনের বাইরের অংশ হল শ্বেতদ্বীপ, অভ্যন্তরভাগ বৃন্দাবন। শ্বেতদ্বীপের অপর নাম গোলোক। **বিষ্ণু পুরাণ, পদ্মপুরাণ এবং মোক্ষ ধর্মের মতে ক্ষীর**

সমুদ্রের উত্তর তীরে এবং **ব্রহ্মাণ্ড পুরাণের** মতে ক্ষীর সমুদ্রের মধ্যে শ্বেত দ্বীপ অবস্থিত। তবে কল্পভেদে উভয় মতই গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন : ১৭৬৭ ॥ কৃষ্ণের জন্মের পূর্বে বসুদেবের পত্নী দেবকীর যে ছয়টি পুত্র জন্মে তাদের নাম কি কি ছিল?

উত্তর : দেবকীর গর্ভজাত ছয়জন পুত্র ছিলেন হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দন এবং ক্রোধহন্তা।

প্রশ্ন : ১৭৬৮ ॥ ষড়দর্শন কি?

উত্তর : ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, পাতঞ্জল, পূর্ব (কর্ম) মীমাংসা এবং বেদান্ত—এই ছয়টিকে ষড়দর্শন বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭৬৯ ॥ ভগবানের ষড়ভূজ মূর্ত্তি কিরূপ?

উত্তর : শ্রীরামচন্দ্রের, শ্রীকৃষ্ণের ও শ্রীগৌরহরির প্রত্যেকের দুইটি করে ছয় হাত বিশিষ্ট শ্রীগৌর মূর্ত্তিকে ভগবানের ষড়ভূজ মূর্ত্তি বলে। শ্রীরামের হাতে ধনুর্বান, শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশী এবং শ্রীগৌরের হাতে দণ্ড কমণ্ডুলু বিরাজ করে। এই মূর্ত্তি পুরীধামের শ্রী মন্দিরের (অক্ষয়বটের দিকে) গায়েও অংকিত আছে।

প্রশ্ন : ১৭৭০ ॥ ভগবানকে ষোড়শ উপাচারে অনেকে পুজা করেন। এই ষোড়শ উপাচার কি?

উত্তর : ষোড়শ উপাচার হল : আবাহন, আসন, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, স্নান, বস্ত্র, আচমনীয়, উপবীত, আচমন, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য এবং পুনরায় আচমন। **(শ্রীহরি ভক্তি বিলাস ৬/৪৬-৪৭)।** অন্যমতে আসন, স্বাগত, পাদ্য, অর্ঘ্য, আচমনীয়, মধুপর্ক, আচমনীয়, স্নান, বসন, আবরণ, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, নৈবেদ্য, বন্দনা।

প্রশ্ন : ১৭৭১ ॥ ষোড়শ মাতৃকা কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : গৌরী, পদ্মা, শচী, মেধা, সাবিত্রী, বিজয়া, জয়া, দেবসেনা, স্বধা, স্বাহা, ধৃতি, পুষ্টি, তুষ্টি, শান্তি, স্বদেবতা এবং কুলদেবতা—এঁরাই হলেন ষোড়শ মাতৃকা।

প্রশ্ন : ১৭৭২ ॥ ভগবানের সম্বিৎ (সংবিৎ) শক্তি কি?

উত্তর : যে শক্তির মাধ্যমে ভগবান নিজেকে সম্যকভাবে (উত্তমরূপে) জানেন এবং অপরকে জানান তাকে সম্বিৎ শক্তি বলে।

প্রশ্ন : ১৭৭৩ ॥ দশবিধ (দশ ধরনের) সংস্কার বলতে কি কি বুঝায়?

উত্তর : দশবিধ সংস্কার হল শুদ্ধিজনক বৈদিক ব্যাপার। বিবাহ, গর্ভাধান, পুংসবন, সীমন্তোন্নয়ন, জাতকর্ম, নামকরণ, অন্নপ্রাশন, চূড়াকরণ, উপনয়ন এবং সমাবর্তন এই হল দশবিধ সংস্কার।

প্রশ্ন : ১৭৭৪ ॥ মৃত্যুর সময় কাদের পক্ষে নাম সংকীর্ত্তন করা সম্ভব এবং দেহত্যাগের পর ভগবানের সাথে সাক্ষাৎকারের সুযোগ হয়?

উত্তর : যাঁর পূর্বজন্মে অথবা এই জন্মে শ্রীভগবৎ আরাধনা সিদ্ধ হয় তাঁর পক্ষেই মৃত্যুকালে নাম সংকীর্ত্তন করা সম্ভব এবং দেহ ত্যাগের পর ভগবানের সঙ্গে সাক্ষাৎকার লাভ হয়। কিন্তু যারা ভজনসিদ্ধ হন নাই, মৃত্যুকালে তাদের মুখে নাম সংকীর্ত্তন হওয়া অসম্ভব। কারণ অপরাধ না থাকলে মৃত্যুর সময় নাম-স্ফুর্ত্তি হয়, অপরাধ থাকলে হয় না।

প্রশ্ন : ১৭৭৫ ॥ সূর্য্যবংশের কোন্ রাজার ষাট হাজার একজন পুত্র ছিল?

উত্তর : সূর্য্যবংশের রাজা বাহুকের পুত্র ছিলেন সগর। বাহুক একসময় রাজ্য হারাইয়া নিজের গুরু মহর্ষি ঔর্বের আশ্রমে নিজের স্ত্রীকে নিয়ে আশ্রয় নেন। ঐ আশ্রমেই সগরের জন্ম হয় এবং মহর্ষি এঁর জাত কর্মাদি সম্পাদন করেন। সগরের এক স্ত্রী কেশিনীর গর্ভে একটি পুত্র অসঞ্জস এবং অপর স্ত্রী সুমতির গর্ভে ষাট হাজার পুত্র উৎপন্ন হয়।

প্রশ্ন : ১৭৭৬ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে যুদ্ধের সমস্ত সংবাদ প্রদান করেন। এই সঞ্জয় কে ছিলেন?

উত্তর : সঞ্জয় ছিলেন সূত গবল্গনের পুত্র। তিনি হস্তিনাপুরের রাজা ধৃতরাষ্ট্রের একজন মন্ত্রী ছিলেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে তিনি আগত রাজাগণের আদর অভ্যর্থনায় নিয়োজিত ছিলেন। অন্ধ রাজা ধৃতরাষ্ট্রের

কাছে থেকে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সব ধরনের সংবাদ তিনি বর্ণনা করেন। যুদ্ধ শেষে ধৃতরাষ্ট্র বানপ্রস্থ অবলম্বন করলে সঞ্জয় তাঁর সাথে বনে গমন করেন এবং একসময় সেখানেই দেহ ত্যাগ করেন।

প্রশ্ন : ১৭৭৭ ॥ ব্রহ্মা যেখানে অবস্থান করেন সেই স্থানের নাম কি? সেখানে যাওয়ার জন্য কি গুন থাকা দরকার?

উত্তর : এই ব্রহ্মাণ্ড চৌদ্দটি লোক বা ভুবন দ্বারা গঠিত। সকল লোকের উপর ভাগে যে সত্যলোক আছে সেখানে ব্রহ্মা বিরাজ করেন। একে ব্রহ্মলোকও বলা হয়। এই ধামে যেতে হলে একশত জন্ম পর্য্যন্ত স্বধর্ম অনুষ্ঠান করতে হয়।

প্রশ্ন : ১৭৭৮ ॥ ভগবান কখন মৎসরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন? তিঁনি কোন্ ধরনের মৎসরূপ ধারণ করেছিলেন?

উত্তর : চাক্ষুষ মন্বন্তর শেষ হলে তপস্যা পরায়ণ সত্যব্রতকে কৃপা করার জন্য ভগবান মৎসরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিঁনি তাকে বেদ উপদেশ দেন। ভগবানের মৎসরূপ ছিল সফরি—অর্থাৎ সরপুটি মাছের রূপ তিনি ধারণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ১৭৭৯ ॥ সদাশিব কে?

উত্তর : শ্রীবিষ্ণুর অংশ বিশেষ হলেন সদাশিব। শৈবমতে সর্বমূল ঈশ্বর-তত্ত্ব এবং বৈষ্ণবমতে সব ধরনের দোষ শূন্য সর্বমঙ্গলকর বিষ্ণুতত্ত্ব।

প্রশ্ন : ১৭৮০ ॥ ভগবানের সন্ধিনী শক্তি কাকে বলে?

উত্তর : ভগবান সৎস্বরূপ হয়েও যে শক্তি দ্বারা নিজে সত্ত্ব ধারণ করেন এবং অপরাপর সকলকে ধারণ করাণ তার সেই সর্বদেশে, সর্বকালে, সর্ববস্তুতে ব্যপ্ত শক্তিকেই সন্ধিনী শক্তি বলে।

প্রশ্ন : ১৭৮১ ॥ রাধা-কৃষ্ণের লীলায় সন্ধিদূতীদের কাজ কি?

উত্তর : এমনসব গোপী যাঁরা রাধা কৃষ্ণের মধ্যে প্রণয়জনিত কোন মান অভিমান অথবা বিবাদ সৃষ্টি হলে কৃষ্ণ দ্বারা প্রেরিত হন। এঁরা শ্রী রাধার মান ভঙ্গ করে উভয়ের মধ্যে আবার সংযোগ ঘটাইয়া দেন। এই কাজের জন্য শ্রীকৃষ্ণ থেকে তাঁরা বিভিন্ন রকমের পুরস্কার লাভ করেন।

আবার শ্রীরাধারও যথেষ্ট প্রীতি লাভ করেন। নারদের কৃপায় এঁরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে ব্রজে বসবাস আরম্ভ করেন। সন্ধিদূতীদের মধ্যে শিবদা, সৌম্যদর্শনা, সুপ্রসাদা, সদাশান্তা, শান্তিদা ও কান্তিদা হলেন প্রধান।

প্রশ্ন : ১৭৮২ ॥ যুগসন্ধি বা যুগসন্ধ্যা কি?

উত্তর : একযুগের অবসানে অন্যযুগ তখনই আরম্ভ হয় না। দুই যুগের মধ্যবর্তী কিছু সময়কে যুগসন্ধ্যা বলা হয়। সত্যযুগে চার, ত্রেতায় তিন, দ্বাপরে দুই এবং কলিতে একশত দিব্য বছরকে যুগসন্ধ্যা বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭৮৩ ॥ আমাদের এই জড়জগতের নীচে যে সাতটি লোক আছে তাদের নাম কি কি?

উত্তর : অতল, বিতল, সুতল, রসাতল, তলাতল, মহাতল এবং পাতাল—এই হল সাতটি লোক।

প্রশ্ন : ১৭৮৪ ॥ আকাশে সপ্তর্ষিমণ্ডল আছে। কোন্ কোন্ ঋষির নামে এই নামকরণ হয়েছে?

উত্তর : মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু এবং বশিষ্ঠ—এই সাত জন ঋষির নামে খ্যাত তারকামণ্ডল উত্তর আকাশে বড় ভালুকের আকারে দেখা যায়। ময়ুর পুচ্ছের মত বাঁকাভাবে অবস্থিত হওয়ায় এই চক্রকে চিত্র শিখণ্ডিও বলে।

প্রশ্ন : ১৭৮৫ ॥ কুরু-পাণ্ডবদের রাজধানী হস্তিনাপুর সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : ভারতের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের মীরাট থেকে ২২ মাইল দক্ষিণ পূর্ব দিকে অবস্থিত একটি নগর ছিল। কুরু বংশের রাজা হস্তির নাম অসুসারে এই নগরী হস্তিনাপুর নামে খ্যাত হয়। রাজা পরীক্ষীতের পুত্র জননেজয়ের পৌত্র (নাতি) নিচক্ষু হস্তিনাপুর ধ্বংস হলে রাজধানী কৌশাম্বীতে স্থাপন করেন। শ্রীবলদেব একসময় হস্তিনাপুরকে তাঁর লাঙ্গলদ্বারা আকর্ষণ করে গঙ্গায় নিক্ষেপ করেন। এ থেকে মনে হয় সেই সময় গঙ্গা হস্তিনাপুরের সামনেই প্রবাহিতা ছিলেন এবং শ্রী পরীক্ষিতের প্রয়োপবেশন স্থানটিও শুকতলাউ বা শুকরতলে ছিল।

প্রশ্ন : ১৭৮৬ ॥ ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ভগবান নিজে আনন্দরূপ হয়েও সম্বিৎশক্তির উৎকর্ষ রূপ যে শক্তি দ্বারা সেই আহ্লাদকে নিজে ভোগ করেন এবং অপর সকলকে অনুভব করান, তাকেই হ্লাদিনী শক্তি বলা হয়। শ্রীমতি রাধাই ভগবানের হ্লাদিনী শক্তি।

প্রশ্ন : ১৭৮৭ ॥ অর্জুন কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে গাণ্ডিব ধনু ব্যবহার করেছিলেন। এই ধনু কে নির্মাণ করেছিলেন এবং কিভাবে অর্জুন এই ধনু পেয়েছিলেন?

উত্তর : গাণ্ডিব ধনু ব্রহ্মা নির্মাণ করেছিলেন। তিঁনি এই ধনু প্রজাপতিকে, প্রজাপতি ইন্দ্রকে, ইন্দ্র সোমকে এবং সোম বরুনকে প্রদান করেছিলেন। খাণ্ডব বন দাহনে (পোড়ানোর) অর্জুন অগ্নিকে সহায়তা করেন। অগ্নি তখন খুশী হয়ে বরুনের কাছে প্রার্থনা করে এই গাণ্ডিবধনু অর্জুনকে এনে দেন।

প্রশ্ন : ১৭৮৮ ॥ ভগবানের সুদর্শন চক্র দেখতে কেমন এবং এর কাজ কি?

উত্তর : সুদর্শন চক্র দেখতে গোলাকার। এর প্রান্ত বা অগ্রভাগ উত্তম কোনযুক্ত এবং খুবই তীক্ষ্ণ বা ধারযুক্ত। এর বর্ন নীল জলের ন্যায়। সুদর্শনচক্র যেকোন শত্রুকে ছেদ, ভেদ, নিপাত এবং শায়িত করতে সক্ষম।

প্রশ্ন : ১৭৮৯ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের সময় দ্রোনাচার্যের পুত্র অশ্বত্থামা একসময় নারায়ণ অস্ত্র পাণ্ডবদের বিনাশের জন্য নিক্ষেপ করেছিলেন। এই অস্ত্র দেখতে কেমন ছিল?

উত্তর : দ্রোনাচার্য ভগবানকে একসময় সেবা করে তাঁর কাছ থেকে এই অস্ত্র লাভ করে নিজের পুত্র অশ্বত্থামাকে প্রদান করেন। এই অস্ত্র থেকে একই সময়ে হাজার হাজার সর্পের ন্যায় বান, লোহার গোলক, শতঘ্নী, শূল এবং ক্ষুরের ন্যায় চক্র নির্গত হয়। এথেকে পরিত্রানের একমাত্র উপায় হল অস্ত্রশস্ত্র ত্যাগ করে—অর্থাৎ নিরস্ত্র অবস্থায় দাড়িয়ে থাকা। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধের ১৫তম দিনে অশ্বত্থামা এই অস্ত্র নিক্ষেপ

করলে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে উপরোক্ত উপায়ে পাণ্ডবগণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পান।

প্রশ্ন : ১৭৯০ ॥ রাক্ষস রাজ রাবন এক সময় লক্ষনের প্রতি শক্তিশেল নামক অস্ত্র নিক্ষেপ করেছিলেন। এই শক্তি শেল কি এবং রাবন কিভাবে এই অস্ত্র পান?

উত্তর : শক্তিশেল হল শত্রুকে অজ্ঞান এবং ভূপাতিত করতে সক্ষম এক ধরনের অস্ত্র। রাবন ময়দানবের মেয়ে মন্দোদরীকে বিবাহ করেন। ময়দানব আটটি ঘণ্টাযুক্ত এই অশনিতুল্য অস্ত্র তৈরী করে রাবনকে উপহার দেন। এই অস্ত্র দ্বারাই রাবন লক্ষ্মণকে ভূপাতিত করেছিলেন।

প্রশ্ন : ১৭৯১ ॥ কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দ্রোনাচার্য একসময় চক্রব্যুহ নির্মাণ করে পাণ্ডবদের পর্য্যুদস্ত করেছিলেন। প্রশ্ন হল ব্যুহ কি এবং কত প্রকার ও কি কি?

উত্তর : ব্যুহ বলতে সৈন্য সমাবেশ বুঝায়—অর্থাৎ সৈন্যদেরকে শৃঙ্খলা সহকারে সাজানো বুঝায়। বিভিন্ন কৌশলে বা আকারে সৈন্যদেরকে সমাবেশ করলে ব্যুহের নাম ভিন্ন ভিন্ন হয়। সাধারণত ব্যুহ ছয় ধরনের : বজ্র, মকর, শকট, শ্যেন, সর্বতো ভদ্র এবং সূচী বা সূচীমুখ। এছাড়াও মহাভারতে উল্লেখিত অন্যান্য ব্যুহের নাম হল ঃ অর্ধচন্দ্র, ক্রৌকারুশ, গারুড়, চক্র, চক্রশকট, পদ্ম, ব্যাস, মণ্ডল, শৃঙ্গাটক এবং সাগর।

প্রশ্ন : ১৭৯২ ॥ পঞ্জিকায় দেখি ১লা ভাদ্র অগস্ত্য যাত্রা। এদিন নাকি কোথায়ও যেতে নেই। প্রশ্ন হল এই অগস্ত্য যাত্রা কি?

উত্তর : অগস্ত্য নামে একজন মহামুনি ছিলেন। সূর্য সুমেরু পর্বতকে প্রতিদিন প্রদক্ষিণ করেন। এই দেখে বিন্ধ্য নামে এক পর্বতের ইচ্ছা হল সূর্য যেন তাকেও প্রদক্ষিণ করেন। সূর্য এতে রাজী হলেন না। তখন বিন্ধ্যপর্বত রাগে নিজের দেহ এমনভাবে বাড়ায় যে সূর্যের পথ রোধ হয়। তখন দেবতারা অগস্ত্য মুনির শরনাপন্ন হন। বিন্ধ্যপর্বতের গুরু ছিলেন অগস্ত্য। অগস্ত্য এই পর্বতের কাছে উপস্থিত হলে বিন্ধ্য

তাঁকে নীচু হয়ে প্রণাম করেন। অগস্ত্য তখন বলেন আমি যতক্ষণ এখানে ফিরে না আসি ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি এভাবেই থাকবে। বিন্ধ্যকে এই অবস্থায় রেখে অগস্ত্য ১লা ভাদ্র দক্ষিণ দিকে চলে যান এবং আর ফিরে আসেন নাই। এইজন্য ১লা ভাদ্র শুভযাত্রার পক্ষে নিষিদ্ধ হয়।

প্রশ্ন : ১৭৯৩ ॥ অগ্নিদেবতার নাকি সাতটি জিহ্বা আছে? থাকলে সেগুলির নাম কি কি?

উত্তর : অগ্নিদেবতার শিখার সংখ্যা সাতটি। এদেরকেই অগ্নির সপ্তজিহ্বা বলা হয়। এগুলো হল : করালী, ধামিনী, শ্বেতা, লোহিতা, নীল-লোহিতা, পদ্মরাগা, সুবর্ণা।

প্রশ্ন : ১৭৯৪ ॥ ঋক্‌বেদের একজন প্রধান দেবতা হলেন অগ্নি। তাঁর স্বরূপ জানতে চাই।

উত্তর : অগ্নি সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে বিভিন্ন বর্ণনা আছে। বিষ্ণুপুরান অনুযায়ী অগ্নি হলেন ব্রহ্মার জৈষ্ঠ্যপুত্র এবং দক্ষকন্যা স্বাহার স্বামী। হরিবংশে অগ্নির বর্ণনা এইভাবে দেওয়া হয়েছে : কৃষ্ণবস্ত্র পরিহিত ধূম্রের ন্যায় পতাকা বহনকারী এবং সংগে জলন্ত বর্শা। অগ্নির বাহন হল ছাগ (ছাগল)। এঁর চারটি হাত এবং লালবর্ণের অশ্বদ্বারা চালিত রথে তিঁনি ভ্রমণ করেন। সপ্ত বসু হলেন তাঁর রথের চক্র। বিভিন্ন নামে তিনি পরিচিত : অনল, পাবক, হুতাশন, বৈশ্বানর, অজ হস্ত, ধূমকেতু, তোমর ধর, হুতভূজ, বহ্নি, রোহিতাশ্ব, ছাগরথ, সপ্তজিহ্বা।

প্রশ্ন : ১৭৯৫ ॥ ভগবানকে অচ্যুত বলা হয় কেন?

উত্তর : নিজ স্থান থেকে ভগবানের কোন চ্যুতি বা ক্ষরণ নাই। তিঁনি নিজের স্বভাব হতে অবিচলিত। সৃষ্টবস্তুর সাথে তাঁর লয় হয় না। এজন্য ভগবানকে অচ্যুত বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭৯৬ ॥ অজামিল কেন এবং কিভাবে বৈকুণ্ঠে যেতে সক্ষম হন?

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল। অজামিল ছিলেন কান্যকুজের একজন সদাচারী ব্রাহ্মণ। শাস্ত্রপাঠ, পুজা-অর্চনা, অতিথি আপ্যায়ন ইত্যাদিতে তিনি সময় অতিবাহিত করতেন। একদিন কুশ সংগ্রহ করতে গিয়ে

অজামিল এক শূদ্রানী অসতীনারীকে ভোগাসক্ত অবস্থায় দেখে তার প্রেমে পড়ে যান এবং নিজের স্ত্রীকে ত্যাগ করে এই শূদ্রানীকে বিয়ে করেন। এই শূদ্রানীর গর্ভে তাঁর আটটি পুত্র জন্ম নেয়। সবচেয়ে ছোট ছেলের নাম ছিল নারায়ণ। এই পুত্রকে তিনি খুব ভালবাসতেন। মৃত্যুর সময় যখন যমদূতেরা তাকে নরকে নিয়ে যাওয়ার জন্য অপেক্ষা করছিল তখন তাদের দেখে ভয়ে তিনি প্রিয় পুত্র নারায়ণের নাম ধরে ডাকেন। এর ফলে সেখানে বিষ্ণু দূতেরা উপস্থিত হয় এবং যমদূতদের তাকে নিয়ে যেতে বাধা দেয়। এভাবে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা পেয়ে অজামিল তপস্যায় রত হন এবং একসময় বিষ্ণুলোকে গমন করেন।

প্রশ্ন : ১৭৯৭ ॥ অদিতিকে দেবতাদের মাতা বলা হয় কেন?

উত্তর : অদিতি ছিলেন দক্ষ প্রজাপতির কন্যা ও কশ্যপমুনির স্ত্রী। ইন্দ্র, বিষ্ণু, সূর্য, ত্বষ্টা, বরুন, অংশ, অর্যমা, রবি, পুষা, মিত্র, বরদমনু এবং পর্জন্য—এই বারজন দেবতার তিনি মাতা। এইজন্য তাকে দেবমাতা বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৭৯৮ ॥ অন্তরীক্ষ বলতে কোন স্থান বুঝায়?

উত্তর : ভূবর্লোক স্বর্গ এবং পৃথিবীর মধ্যবর্তী স্থানকে অন্তরীক্ষ বলা হয়। এখানে গন্ধর্ব, অপ্‌সরা এবং যক্ষগণ বসবাস করেন।

প্রশ্ন : ১৭৯৯ ॥ স্বর্গের অপ্‌সরা কারা? এদের উৎপত্তি কিভাবে হয়? কিছু অপ্‌সরার নাম জানতে চাই।

উত্তর : অপ্ শব্দের অর্থ হল জল। সরা শব্দের অর্থ উৎপন্ন। কাজেই জল থেকে যারা উৎপন্ন হয়েছে তাদেরকে অপ্‌সরা বলা হয়। দেবতা এবং অসুরদের সমুদ্র মন্থন থেকে এদের উৎপত্তি হয়। দেবতা এবং দানবদের মধ্যে কেউ এদেরকে গ্রহণ না করায় এরা সাধারণ স্ত্রীরূপে গণ্য হয়। কামদেব হলেন অপ্‌সরাদের অধিপতি। এরা নৃত্য এবং বিভিন্ন কলায় পারদর্শী। অপ্‌সরাদের মধ্যে উর্বশী, মেনকা, রম্ভা, তিলোত্তমা, ঘৃতাচী, অলম্বুষা, বিদ্যুৎপর্না, সুকেশী, মঞ্জু ঘোষা, সুবাহু, সুপ্রিয়া, সরসা, বিশ্বচী হলেন উল্লেখযোগ্য। এরা স্বর্গের স্বাধীনা নারী—অর্থাৎ যে কোন পরুষের সাথে ইচ্ছামত বিহার করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৮০০ ॥ দেবরাজ ইন্দ্রের রাজধানীর নাম কি? সেখানে কি কি আছে?

উত্তর : ইন্দ্রের রাজধানীর নাম হল অমরাবতী। এই নগর বিশ্বকর্মা তৈরী করেন। এটি সুমেরু পর্বতের উপর অবস্থিত। এখানে নন্দন কানন, পারিজাত বৃক্ষ, সুরভী গাভী, অপ্‌সরা ইত্যাদি আছে। নন্দনকাননে মন্দার, পারিজাত, সন্তানক, কল্পবৃক্ষ এবং হরিচন্দন এই পাঁচটি গাছ বিশেষভাবে বিখ্যাত। অলকানন্দা নদী এই অমরাবতীর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত।

প্রশ্ন : ১৮০১ ॥ লক্ষ্মীদেবীর বড় বোনের নাম নাকি অলক্ষ্মী? তাহলে তিনি কিভাবে আবির্ভূতা হয়েছেন? তার স্বরূপ কি?

উত্তর : সমুদ্র মন্থনের সময় লক্ষ্মীদেবীর বড় বোন অলক্ষ্মী রক্তমালা এবং রক্তকমলে ভূষিতা হয়ে সমুদ্র থেকে আবির্ভূতা হন। এর বস্ত্র কালোবর্ণের, তিনি দুই হাত বিশিষ্ট, হাতে ঝাটা, লোহার দ্বারা তৈরী অলঙ্কার পরিহিতা, তার বাহন হল গাধা। এর সমস্ত অঙ্গ কাঁকরের চন্দন লিপ্ত। তাকে দুভার্গ্যের দেবী বলা হয়।

আবির্ভূতা হওয়ার পর দেবতা এবং অসুরদের মধ্যে কেউ তাকে বিয়ে করতে রাজী না হওয়ায় একজন মহাতপা মুনি তাকে স্ত্রীরূপে গ্রহণ করেন। কিন্তু পরে একে ত্যাগ করতে বাধ্য হন।

প্রশ্ন : ১৮০২ ॥ দুর্গাদেবীর নাকি আটটি শক্তি আছে? এই শক্তিগুলি কি কি?

উত্তর : দুর্গার আটটি শক্তি হল : উগ্রচণ্ডা, প্রচণ্ডা, চণ্ডোগ্রা, চণ্ডনায়িকা, অতিচণ্ডা, চামুণ্ডা, চণ্ডা, চণ্ডবতী। অন্যমতে মঙ্গলা, বিজয়া, ভদ্রা, জয়ন্তী, অপরাজিতা, নন্দিনী, নারসিংহী এবং কৌমারী।

প্রশ্ন : ১৮০৩ ॥ শাস্ত্র অনুযায়ী দেবী দুর্গার কতটি রূপ আছ?

উত্তর : ঋক্‌বেদ অনুযায়ী দেবী দুর্গার সাতটি রূপ আছে। (i) ব্রহ্মানী (ii) মাহেশ্বরী (iii) বৈষ্ণবী (iv) ইন্দ্রানী বা কৌমারী (v) বারাহী (vi) নারসিংহী এবং (vii) চামুণ্ডা। পরবর্তীকালে মার্কণ্ডেয় পুরানের অন্ত গর্ত শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবী মহামায়া বা দুর্গার ১১টি রূপের কথা বলা হয়েছে।

১. শবাসনা চামুণ্ডা, ২. মহিষের উপরে বসা বারাহী, ৩. হাতির উপর বসা ঐন্দ্রী, ৪. গরুড়ের উপর বসা বৈষ্ণবী, ৫. মহাবীর্যা নারসিংহী, ৬. মহাবলা শিবদূতী, ৭. বলদ বা বৃষের উপর বসা মাহেশ্বরী, ৮. শিখিবাহনা কৌমারী, ৯. পদ্মফুলের উপর বসা এবং হাতে পদ্মফুল বিশিষ্টা বিষ্ণুপ্রিয়া মহালক্ষ্মী, ১০. বৃষ বা বলদের উপর বসা সাদাবর্ণ বিশিষ্টা ঈশ্বরী এবং ১১. হংসের উপর বসা সবধরনের অলঙ্কারে সজ্জিতা ব্রাহ্মী।

প্রশ্ন : ১৮০৪ ॥ দুর্গাপুজার সময় দেখা যায় একটি কলাগাছ ব্যবহার করা হয়। কেউ কেউ বলেন এই হল কলা-বৌ। আবার অন্যেরা বলেন এই হল গণেশের স্ত্রী। আসলে কি তাই?

উত্তর : একে নবপত্রিকা বলা হয়। এই নবপত্রিকাই দুর্গা। নবপত্রিকার প্রতীকে দেবীর যে নয়টি রূপের আধার কল্পনা করা হয় সেগুলো হল—

১. **কলা গাছ :** দেবী ব্রহ্মাণী।
২. **কচু গাছ :** দেবী কালিকা।
৩. **হলুদ গাছ :** দেবী দুর্গা।
৪. **জয়ন্তী গাছ :** দেবী কার্তিকী।
৫. **বেলগাছ :** দেবী শিবা।
৬. **দাড়িম্ব (ডালিম) গাছ :** দেবী রক্ত দন্তিকা।
৭. **অশোক গাছ :** দেবী শোক রহিতা।
৮. **মান গাছ :** দেবী চামুণ্ডা।
৯. **ধান গাছ :** দেবী লক্ষ্মী।

প্রশ্ন : ১৮০৫ ॥ দুর্গাপুজার সময় অনেক স্থানেই দেখি নয়টি ঘট স্থাপন করে দেবীর পুজা করা হচ্ছে। এই নয়টি ঘট স্থাপনের পেছনে কোন কারণ আছে কি?

উত্তর : হ্যাঁ। দেবী দুর্গার নয়টি শক্তি রূপের ভাবনা থেকেই নয়টি ঘট স্থাপনের বিষয়টি এসেছে। অর্থাৎ নয়টি রূপের পুজার জন্যই নয়টি ঘট স্থাপনের বিধি শাস্ত্রে উল্লেখ করা আছে। এই নয়টি রূপ হল :

১. উগ্রচণ্ডা ২. প্রচণ্ডা ৩. চণ্ডোগ্রা ৪. চণ্ডনায়িকা ৫. চণ্ডা ৬. চণ্ডবতী ৭. চণ্ডরূপা ৮. অতিচণ্ডিকা এবং ৯. রুদ্রচণ্ডী। প্রতিটি রূপে দেবী একটি করে অসুরকে বধ করেছেন। মহাষ্টমীর দিন দুর্গার এই নয়টি শক্তির পুজা করে দেবীর সহচরী চৌষট্টী এবং কোটী যোগিনীরও পুজা করতে হয়।

প্রশ্ন : ১৮০৬ ॥ দুর্গার এক নাম চামুণ্ডা। কেন তাঁর নাম এরূপ হয়েছে?

উত্তর : চণ্ড ও মুণ্ড নামক দুইজন অসুর দেবীর সাথে যুদ্ধ করতে আসলে দেবীর কপাল থেকে দেবী কালিকার সৃষ্টি হয়। এই দেবী কালিকা ধারণ করেন বিচিত্র নর কঙ্কাল এবং তাঁর গলায় থাকে নরমুণ্ডমালা। তার পরনে বাঘের ছাল, দেহ অতি কৃশ এবং মুখ বিশাল, চোখ কোটরাগত এবং রক্তবর্ণের। প্রবল যুদ্ধের পর দেবী কালিকা চণ্ড এবং মুণ্ডের মাথা কেটে দেবী অম্বিকা বা দুর্গাকে উপহার দেন। চণ্ড ও মুণ্ডকে নিধন করার পর দেবী কালিকার—অর্থাৎ দুর্গার নাম হয় চামুণ্ডা।

প্রশ্ন : ১৮০৭ ॥ দশ মহাবিদ্যা কি?

উত্তর : বিশেষ অবস্থায় দেবী দুর্গা দশটি রূপ ধারণ করেছিলেন। একেই দশ মহাবিদ্যা বলা হয়। এই দশটি রূপ হল : কালী, তারা, ষোড়শী, ভৈরবী, ভূবনেশ্বরী, ছিন্নমস্তা, ধূমাবতী, বগলা, মাতঙ্গী এবং কমলা।

প্রশ্ন : ১৮০৮ ॥ মৃত্যুর পর নাকি মানুষ প্রেতদেহ লাভ করে। প্রশ্ন হল এই প্রেতদেহের স্থায়িত্ব কতদিন?

উত্তর : প্রেতদেহ মোচনের কাল সব জীবাত্মার জন্য একই রকম হয় না। এই সম্পর্কে বিভিন্ন মত আছে। গ্রীক দার্শনিক প্লেটো তাঁর Freedom বইতে বলেছেন, জীবের মৃত্যুর পর এক হাজার বছর পর পুণরায় জন্ম হয়। কিছু কিছু পরতত্ত্ববাদীর মতে মৃত্যুর পর পুণরায় জন্মগ্রহণের সময় লাগে দেড় হাজার বছর। কিন্তু জাতিস্মরদের (যারা আগের জন্মের কথা মনে করতে পারে) জন্ম লক্ষ্য করলে উপরের ধারণা সকল ক্ষেত্রে মেনে নেয়া যায় না।

আমাদের স্মৃতিশাস্ত্র অনুযায়ী সাধারণত একবছর লাগে বলে বছরের শেষে সপিণ্ডীকরণের ব্যবস্থা আছে। আসলে প্রেত দেহ থেকে মুক্তির কাল বা সময় নির্ভর করে জীবের নিজের গতি প্রকৃতির উপর। তবে প্রেত ভাব বিমোচনের জন্য সনাতন ধর্মে অনেক ক্রিয়াকাণ্ড আছে যা জীবাত্মার জন্য মঙ্গলজনক, পুণরায় জন্ম গ্রহণের জন্য সহায়ক। যেমন শ্রাদ্ধ, গয়ায় পিণ্ডদান ইত্যাদি।

প্রশ্ন : ১৮০৯ ॥ মানুষের মৃত্যুর পরেতো তার আর স্থুলদেহ থাকে না। তাহলে মৃত্যুর পর যে পিণ্ডদানের ব্যবস্থা আছে সেই পিণ্ড কে গ্রহণ করে?

উত্তর : সাধারণ মানুষের মৃত্যুর পর পিণ্ডদানের যে ব্যবস্থা আছে তাতে মৃত ব্যক্তির কোন উপকার হয় কিনা সে সম্পর্কে এক সময় ঋষিদের মধ্যেও সংশয় দেখা দিয়েছিল। তাই দেবতা এবং ঋষিরা মিলে ব্রহ্মার কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন—এই স্থুল বা পঞ্চভূত দ্বারা তৈরী (মাটি, জল, বায়ু, অগ্নি এবং আকাশ বা ইথার দ্বারা তৈরী দেহকেই স্থুল দেহ বলে) দেহ পঞ্চভূতে মিশে গেলে সেই আত্মা কোথায় যায় এবং কোথায় থাকে। ব্রহ্মা বললেন—আত্মা দেহ ত্যাগ করলে প্রথমে জলে এবং অগ্নিতে অবস্থান করে। পরে আকাশে গমন করে। একদিন বায়ুতে অবস্থান করে। তারপর ভোগ দেহ তৈরী হয়—সেই যুক্ষ্ম ভোগ দেহই পিণ্ড গ্রহণ করে।

প্রশ্ন : ১৮১০ ॥ মৃত্যুর পর আত্মাকে প্রেতদেহ থেকে মুক্ত করার জন্য শ্রাদ্ধ করা অত্যাবশ্যক কি?

উত্তর : প্রেতদেহের শুদ্ধির জন্য স্মৃতি শাস্ত্রের বিধান অনুযায়ী শ্রাদ্ধ করা কর্তব্য। এতে আত্মার যে মহাকল্যান হয় তাতে কোন সন্দেহ নাই। বিষ্ণু সংহিতা (২০/৩৬) অনুযায়ী এই অনুষ্ঠান যার জন্য করা হয় এবং যে করে—তাদের উভয়েরই কল্যাণ হয়। সেজন্য শ্রাদ্ধ করা অবশ্যই কতর্ব্য। অবশ্য মৃতের জন্য শোক করা মোটেই উচিৎ নয়। তবে যারা জীবনে সাধন-ভজন করে ভগবৎ দর্শন করেছেন তাঁদের বেলায় আর শ্রাদ্ধ-পিণ্ডের কোন প্রয়োজন হয় না। কারণ কামনা-বাসনা যাঁদের ক্ষয় হয়ে গিয়েছে তাঁদের আর সুক্ষ্ম শরীর বা প্রেতদেহ থাকতে

পারে না। তাঁরা দিব্য বা চিন্ময় দেহ নিয়ে ভগবৎ ধামে চলে যান। কিন্তু সাধারণ মানুষের জন্য পূরক-পিণ্ডদানের ব্যবস্থা রয়েছে শাস্ত্রে।

প্রশ্ন : ১৮১১ ॥ মৃত্যুর পর পুত্র-পরিজন মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে দশদিনে দশটি পিণ্ডদান করে। এতে কি হয়?

উত্তর : মরণের পর মৃত ব্যক্তির উদ্দেশ্যে পুত্র-কন্যা প্রথম দিনে যে পিণ্ডদান করে তাতে ষোড়শ কলার সৃষ্টি সম্ভব হয়। দ্বিতীয় দিনে পিণ্ডদান হেতু মৃত ব্যক্তির মাংস, রক্ত এবং চর্মের উৎপত্তি হয়। পঞ্চভূত, পঞ্চপ্রাণ এবং ছয় ইন্দ্রিয় নিয়েই ষোড়শকলা। তৃতীয় দিনের পিণ্ডদানে মৃত ব্যক্তির বুদ্ধি উৎপন্ন হয়। চতুর্থ দিনের পিণ্ডদান হেতু অস্থি ও মজ্জা গঠন হয়। পঞ্চম দিনের পিণ্ড থেকে হাতের আঙুল, মাথা ও মুখ, ষষ্ঠ দিবসে কণ্ঠ, হৃদয়, তালু গঠন হয়। সপ্তম দিনে দীর্ঘ পরমায়ু, অষ্টমদিনে বাক্য, পুষ্টি ও বীর্যবান, নবম দিনে সর্ব-ইন্দ্রিয়ের সমাবেশ হয় এবং দশম দিনে ক্ষুধা ও পিপাসার উদ্রেক হয়। এইভাবে পিণ্ডদান দ্বারা শরীরের সমস্ত অঙ্গের উৎপত্তি সম্ভব হয়। তবে মনে রাখতে হবে এইভাবে তৈরী দেহ কিন্তু আগের মত স্থুলদেহ নয় বরং সুক্ষ্ম দেহ। শরীরের স্থুলদেহ তৈরী হয় বাবা-মায়ের কাছ থেকে। মৃত্যুর পর জীব আকাশে কোন অবলম্বন ছাড়া থাকার সময় এই সুক্ষ্মদেহে ভোগের বাসনা থাকলেও স্থুলদেহের সাহায্য ছাড়া পুরাপুরি ভোগ করতে অসমর্থ হয়। সেজন্য তার স্থুলদেহের প্রয়োজন হয় এবং এই কারণেই একসময় আবার মানুষের পুর্নজন্ম হয়।

প্রশ্ন : ১৮১২ ॥ যারা নাস্তিক অর্থাৎ ভগবানকে মানে না মৃত্যুর পর তাদের শ্রাদ্ধ না করলে কি গতি হবে?

উত্তর : মৃত্যুর পর আত্মা সাংসারিক ব্যাপারে আসক্তি থাকার জন্য আশেপাশেই ঘুরে বেড়ায়। তারা সুক্ষ্ম বা প্রেতদেহেই ক্ষুধা তৃষ্ণা অনুভব করে। তখন শ্রাদ্ধ করলেই তারা শান্তি পায় এবং স্থুলদেহ গঠনের অর্থাৎ পুর্নজন্মের জন্য তৈরী হতে পারে। বাস্তবে বেশীরভাগ ক্ষেত্রে নাস্তিকদের সন্তানরাও নাস্তিক হয়। অর্থাৎ পিতৃপুরুষের প্রতি পুত্রের বিশ্বাস না থাকায় প্রেতদেহে সন্তানের কাছে সাহায্য প্রার্থী হলেও

তাদের বঞ্চিত হতে হয়। ফলে তারা প্রেতদেহেই বহুকাল অবস্থান করতে বাধ্য হয়।

প্রশ্ন : ১৮১৩ ॥ বেদে কি শ্রাদ্ধ-তর্পনের কথা রয়েছে?

উত্তর : শ্রাদ্ধ-তর্পনকে বৈদিক যুগে যজ্ঞ বলা হত। পিতৃ-তর্পনকে পিতৃমেধ যজ্ঞ বলার প্রচলন ছিল। ঋক্‌বেদের অনেক সুক্তে এর প্রমান আছে। সেখানে শ্রদ্ধার সঙ্গে ভক্তিমাখা হৃদয়ে পিতৃপুরুষদের আহ্বান করা হয় এবং শ্রাদ্ধের অর্ঘ্য নিবেদন করে দাতা এবং গ্রহণকারী উভয়ের কল্যাণ-প্রার্থনা চিন্তা, শান্তি-বিধানের ভাবনা ইত্যাদি এইসব সুক্তে নিহিত রয়েছে। (ঋক্‌বেদ, ১০/১৪/৬, ১০/১৫/৬, ১০/১৫/১১, ১০/১৫/৫)।

প্রশ্ন : ১৮১৪ ॥ শ্রাদ্ধ, তর্পন ও পিণ্ডদান করলে কি জীবের মুক্তি লাভ হয়?

উত্তর : শ্রাদ্ধ, তর্পন এবং পিণ্ডদানের যে ব্যবস্থা রয়েছে তার দ্বারা মৃত্যুর পর সুক্ষ্ম দেহ ধারী জীবের মুক্তি হয় না। তবে আবার স্থূলদেহে ফিরে আসার পক্ষে সহায় বা প্রেতলোকের দুঃখকষ্টের কিছুটা লাঘব হয় মাত্র। মুক্তি বা মোক্ষ কেবলমাত্র ভগবৎ ভক্ত হতে পারলেই লাভ করা সম্ভব।

প্রশ্ন : ১৮১৫ ॥ যারা সৎকর্ম করেন তারা নাকি স্বর্গে যান এবং সেখানে সুখভোগ করে আবার মর্তলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কিভাবে?

উত্তর : স্বর্গ বলতে শ্রুতিশাস্ত্র অনুযায়ী চন্দ্রলোক বুঝায়। যাঁরা সৎকর্ম করেন তারা ধূমাদি দেবলোক থেকে পিতৃলোক, পিতৃলোক হতে আকাশ এবং আকাশ থেকে চন্দ্রলোকে গিয়ে সেখানে দেবগণের অধীনে সুখভোগ করেন। এই সুখভোগ নির্ভর করে তাঁর যেটুকু সৎকর্ম ফল আছে তার উপর। আবার কর্মফল শেষ হলেই সেখান থেকে পতিত হন **(মুণ্ডক উপনিষদ ১/২/১০)**। পতনের সময় তারা অচেতন হয়ে পড়েন। অচেতন হয়েই বায়ুমণ্ডলে মেঘ-বৃষ্টিরূপে ভূমিতে পড়ে শস্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই শস্যই পুরুষ জীবের গর্ভে গিয়ে বীর্য

এবং স্ত্রীজীবের গর্ভে রজঃ রূপে (রক্ত রূপে) আত্মপ্রকাশ করে এবং একসময় স্ত্রী-পুরুষের মিলনে ভ্রূণরূপে জন্ম নেয় এবং ধীরে ধীরে স্থুল জীবরূপে প্রকাশিত হয় বা জন্ম নেয়।

প্রশ্ন : ১৮১৬ ॥ ভগবানকে শ্রীহরিও বলা হয়। কেন?

উত্তর : ভগবানকে হরি বলা হয় মূলত দুই কারণে।

প্রথমত : তিনি জীবের সমস্ত অমঙ্গল হরণ করেন বলে তার নাম হরি।

দ্বিতীয়ত : তিনি জীবকে প্রেম দিয়ে মন হরণ করেন বলে তাঁর নাম হরি।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

হরি শব্দের বহু অর্থ, দুই মুখ্যতম।
সর্ব্ব অমঙ্গল হরে, প্রেম দিয়া হরে মন ॥

(চৈ. চ. ২/২৪/৪৪)

প্রশ্ন : ১৮১৭ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে কোন্ কোন্ ধরনের ভক্তের প্রেম আস্বাদন করেছিলেন?

উত্তর : ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ ব্রজে চার ভাবের ভক্তের প্রেম রস আস্বাদন করেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য এবং মধুর।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের দাস্য ভাবের ভক্ত হলেন রক্তক, পত্রক প্রমুখ। সখ্যভাবের ভক্ত হলেন সুবল, শ্রীদাম, মধুমঙ্গল ইত্যাদি। বাৎসল্য ভাবের পরিকর হলেন নন্দ-ঈশানাদি এবং মধুর রসের পরিকর হলেন শ্রীরাধা ও তার সখীগণ। এঁরা সবাই শ্রীকৃষ্ণের নিত্য পরিকর। অনাদিকাল থেকে তাঁরা শ্রীকৃষ্ণকে নিজ নিজ ভাবে প্রেমরস আস্বাদন করাচ্ছেন।

প্রশ্ন : ১৮১৮ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য—এই উভয় স্বরূপেই ভগবান এই ধরাধামে এসেছেন। তাঁদের এই দুই স্বরূপের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে এবং শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য স্বরূপে পার্থক্য এই যে, ব্রজের শ্রীকৃষ্ণ স্বরূপে শ্রীরাধার ভাব—মাদনাখ্য ভাব নাই, শ্রীরাধার

উজ্জ্বল গৌরকান্তিও নাই। নবদ্বীপের শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যস্বরূপে শ্রী রাধার মাদনাখ্য মহাভাবও আছে, গৌরকান্তিও আছে। তাই শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যকে রাধাভাব-দ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণ বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৮১৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য এবং শ্রীনিত্যানন্দ কি স্বরূপত একই?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য ও শ্রীনিত্যানন্দ **"একই স্বরূপ দোঁহে—ভিন্ন মাত্র কায়। দুই ভাই এক তনু সমান প্রকাশ।"**

প্রশ্ন : ১৮২০ ॥ ইসকন ভক্তরা একে অপরকে দেখলে প্রথমেই হরেকৃষ্ণ বলেন। এর কারণ কি?

উত্তর : বৈষ্ণবদের মধ্যে এখনও রীতি দেখা যায় যে কাউকে আহ্বান করার সময় অথবা কারো মনোযোগ আকর্ষণ করার জন্য তার নাম ধরে বা সম্পর্ক উল্লেখ করে ডাকেন না, বা অন্য কোন কথাও বলেন না বরং জয় গৌর, বা জয় নিতাই, বা জয় রাধে বা রাধেশ্যাম, অথবা হরেকৃষ্ণ ইত্যাদি শব্দের উচ্চারণ করেন। এই হল বৈষ্ণবদের মনোযোগ আকর্ষণের সাঙ্কেতিক বাক্য।

প্রশ্ন : ১৮২১ ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায় শ্রীমদনমোহন, শ্রীগোবিন্দ এবং শ্রী গোপীনাথ—এই তিন ঠাকুর গৌড়িয়াকে করিয়াছেন আত্মসাথ। এসব কথার মানে কি?

উত্তর : উক্ত তিন বিগ্রহের সেবাই বাঙালী ভক্তদ্বারা প্রকাশিত। যেমন শ্রীমদনমোহন দেবের সেবা শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর দ্বারা প্রকাশিত, শ্রীগোবিন্দদেবের সেবা শ্রীপাদ রূপ গোস্বামীর প্রকাশিত এবং শ্রী গোপীনাথদেবের সেবা শ্রীপাদ মধুপণ্ডিতের প্রতিষ্ঠিত। শ্রী সনাতন, শ্রীরূপ এবং শ্রীমধুপণ্ডিত—এঁরা সকলেই গৌড়দেশবাসী ও বাঙ্গালী। শ্রীমদনমোহনাদি তাঁদের সেবা অঙ্গীকার করেন এবং এর মাধ্যমে সমস্ত গৌড়দেশবাসীকেই সেবকরূপে অঙ্গীকার করেছেন।

প্রশ্ন : ১৮২২ ॥ শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীগৌরহরির কোন্ স্বরূপ?

উত্তর : শাস্ত্রে বলা হয়েছে—

একই বিগ্রহ কিন্তু আকারে হয় আন।
অনেক প্রকাশ হয় বিলাস তার নাম ॥

কাজেই শ্রী নিত্যানন্দকে স্বরূপতঃ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর বিলাস রূপ বলা যায়। কারণ এই দুইজন স্বরূপে এক হলেও বর্ণে তাঁদের পার্থক্য আছে। শ্রীমন্ মহাপ্রভু উজ্জ্বল গৌরবর্ণ, আর শ্রীমন্ নিত্যানন্দ প্রভু রক্তার্ভ-গৌরবর্ণ।

প্রশ্ন : ১৮২৩ ॥ ভক্তিশাস্ত্র অনুসারে শ্রীগুরুদেব যদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়ভক্তই হন তাহলে তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বলে মনে করার উদ্দেশ্য কি? শাস্ত্রে তাঁকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলারই বা তাৎপর্য কি?

উত্তর : পরস্পর নিবিড় প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ দুইজন লোককে যেমন অভিন্ন হৃদয় বা অভিন্ন বলা হয়, তেমনি শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত বলেই শ্রীকৃষ্ণের সাথে তাঁর অভেদ মনে করা হয়। প্রিয়ত্বাংশেই তাঁদের মধ্যে অভেদ। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামীপাদ তাঁর **ভক্তিসন্দর্ভ** গ্রন্থে এই সিদ্ধান্তই প্রকাশ করেছেন। যেমন তিঁনি বলেছেন, শ্রীশিব এবং শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলেই শুদ্ধভক্তগণ শ্রীভগবানের সাথে তাঁদের অভেদ মনে করেন।

শ্রীমদ্ ভাগবতেও এর অনুকুল প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন শ্রীপ্রচেতাগণের গুরু ছিলেন শ্রীশিব। শ্রীশিবের অপর নাম ভব। প্রচেতাগণ তাঁদের গুরুদেব ভবকে ভগবানের **"প্রিয় সখা"** বলেই বর্ণনা করেছেন। (ভাগবত ৪/৩০/৩৮)। শ্রীল রঘুনাথ গোস্বামীর মনঃশিক্ষা থেকেও একই প্রমাণ পাওয়া যায়।

গুরু ও ভগবানের অভেদ-উপদেশের অনেক কথা শাস্ত্রে থাকলেও শুদ্ধ ভক্তগণ এইরূপই (গুরুকে ভগবানের প্রিয় সখা বা প্রিয় ভক্ত বলিয়াই) মনে করেন।

প্রশ্ন : ১৮২৪ ॥ গুরুই ব্রহ্মা, গুরুই বিষ্ণু, গুরুই মহেশ্বর, গুরুই পর-ব্রহ্ম—এইসব কথা বলার তাৎপর্য কি?

উত্তর : এইসব কথা বলার তাৎপর্য্য এই যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এবং এমনকি পরব্রহ্ম যেমন পূজনীয়, গুরুদেবও সেইরূপ পূজনীয়।

প্রশ্ন : ১৮২৫ ॥ শ্রীমদ্ ভাগবতে (১১/১৭/২৭) ভগবান বলেছেন আচার্য্যকে আমি বলিয়াই মানিবে, কখনও তাঁর অবমাননা করবে না। মনুষ্য বুদ্ধিতে কখনও তাঁর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করবে না। কারণ গুরু সর্বদেবময়। তাহলে ভাগবতের এই প্রমাণ অনুসারে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ থেকে অভিন্ন মনে করাইতো উচিত? এমতাবস্থায় তাঁকে শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম—ভক্ত বলে চিন্তা করার হেতু কি?

উত্তর : অর্চন বিধিতে (শ্রীহরি ভক্তিবিলাস ৪/১৩৪) দেখা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন—প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে পুজা করে তারপর আমার পুজা করবে। এভাবে যে করে সেই ব্যক্তিই ভক্তিযোগে সিদ্ধি লাভ করতে পারে। অন্যথা তার সমস্তই বিফল হয়। এই প্রমাণে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই গুরুদেবকে তাঁর থেকে ভিন্ন বলে উল্লেখ করেছেন। কারণ আগে গুরু পুজা, তারপর কৃষ্ণ পুজা—এই বিধি থেকেই বুঝা যায় গুরু এবং কৃষ্ণ স্বরূপত এক নন। শ্রীগুরুকে কৃষ্ণ বলে মনে করার যে আদেশ, তার তাৎপর্য হল শ্রীগুরু শ্রীকৃষ্ণের মতই পুজ্য।

প্রশ্ন : ১৮২৬ ॥ শ্রীগুরুদেব কি স্বয়ং বা স্বরূপতঃ কৃষ্ণ?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের মত গুরুকেও পুজা করতে হবে—এই বুদ্ধি ভক্তদের মধ্যে বজায় থাকার জন্যই শাস্ত্রে গুরুকে কৃষ্ণের তুল্য বা কৃষ্ণের প্রকাশতুল্য মনে রাখার ব্যবস্থা রয়েছে। স্বরূপত গুরুদেব কৃষ্ণ নন, কৃষ্ণের প্রকাশও নন। কারণ কৃষ্ণ একাধিক থাকতে পারেন না। গুরু অনেক। প্রকাশরূপে এবং স্বয়ংরূপেও বর্ণনা দিতে পার্থক্য নেই। কৃষ্ণের প্রকাশরূপও কৃষ্ণের অনুরূপ : নবকিশোর, নটবর, গোপবেশ, বেনুকর ইত্যাদি। শ্রী গুরুদেব যদি স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশই হতেন তাহলে শ্রীগুরুদেবের আকারও শ্রীকৃষ্ণের অনুরূপ হতো। তবে তত্ত্বতঃ শ্রীগুরুদেব শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত হলেও শিষ্য তাঁকে ভগবানের আবির্ভাব-বিশেষ বলেই মনে করবেন। (এই বিষয়ে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন : শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃত আদিলীলা, ড. শ্রী রাধাগোবিন্দ নাথ, পৃ. ৩৮-৩৯)।

প্রশ্ন : ১৮২৭ ॥ শ্রুতিশাস্ত্রে বলা হয়েছে ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি নাকি ব্রহ্মই হয়ে যান। সত্যি কি?

উত্তর : শ্রুতি বলেন "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"—অর্থাৎ নির্ভেদ ব্রহ্ম অনুসন্ধান-জ্ঞান দ্বারা যিনি ব্রহ্মকে অবগত হতে পারেন, তিনিও ব্রহ্মই হন। তবে এই শ্রুতিবচনের ব্রহ্মৈব শব্দের দুই রকম অর্থ হয়। জ্ঞানমার্গের আচার্য্যবর্গ বলেন, ব্রহ্মবিদ ব্যক্তি ব্রহ্ম হয়ে যান, ব্রহ্মের সাথে তাঁর আর কোন অংশেই ভেদ থাকে না। কিন্তু ভক্তি মার্গের আচার্য্যগণ বলেন—ব্রহ্মবিদ ব্রহ্ম হয়ে যান না বরং ব্রহ্মতূল্য হতে পারেন মাত্র। আগুনের স্পর্শে লোহা যেমন এক সময় আগুনের মতই হয়ে যায় বা সমতূল্য হয় তেমনি ব্রহ্মের সংশ্রবে ব্রহ্মবিদ ব্যক্তিও ব্রহ্মতা প্রাপ্ত হতে পারেন। ব্রহ্মের সাথে তাঁর কোন ভেদ লোপ পায় না।

প্রশ্ন : ১৮২৮ ॥ কৃষ্ণ কি ব্রহ্মার দীক্ষা গুরু এবং শিক্ষা গুরু উভয়ই ছিলেন?

উত্তর : ব্রহ্মসংহিতা গ্রন্থ থেকে দেখা যায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ব্রহ্মাকে তাঁর বেনুর মাধ্যমে আঠার অক্ষর বিশিষ্ট মন্ত্রে দীক্ষা দিয়েছেন। আবার শ্রীভগবান আচার্য্যরূপে ব্রহ্মাকে তত্ত্ব জ্ঞানোপদেশ দিয়েছেন এবং অন্তর্যামিরূপে ব্রহ্মার চিত্তে উপদিষ্ট তত্ত্বের অনুভব জন্মাইয়াছেন। এভাবে শ্রীভগবান শিক্ষাগুরুরূপেও ব্রহ্মাকে শিক্ষা দিয়েছেন।

প্রশ্ন : ১৮২৯ ॥ শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের গুরুদেবের নাম কি ছিল।

উত্তর : শ্রীল বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের দীক্ষাগুরুর নাম শ্রীল সোমগিরি।

প্রশ্ন : ১৮৩০ ॥ শ্রীগুরুদেবকে কেউ কেউ বলে থাকেন চিন্তামণি। এর তাৎপর্য্য কি?

উত্তর : চিন্তামণি হল একধরনের অতিমূল্যবান মণি। এই মনির কাছে যা চাওয়া হয়, তাই পাওয়া যায়। শ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয় করলে সকল অভীষ্ট পূর্ণ হয়। তাই শ্রীগুরুদেবকে এক অর্থে চিন্তামণিও বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৮৩১ ॥ চিন্তামণি নামের এক বেশ্যা নাকি শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বর্ত্মাদেশগুরু ছিলেন? হলে কিভাবে?

উত্তর : বর্ত্মাদেশগুরু বলতে পরমার্থের পদপ্রদর্শক বুঝায়। শ্রীবিল্বমঙ্গল ঠাকুর একসময় চিন্তামণি নামক এক বেশ্যার অনুগত ছিলেন। কিন্তু কোন এক ঘটনায় এই বেশ্যার শ্লেষপূর্ণ বাক্যেই বিল্বমঙ্গলের মোহ ঘুচে যায় এবং ভগবানকে পাওযার জন্য তিনি ঘরের বাহির হয়ে পড়েন। এই অর্থে চিন্তামণি বেশ্যাই ছিলেন বিল্বমঙ্গল ঠাকুরের বর্ত্মাদেশ গুরু।

প্রশ্ন : ১৮৩২ ॥ সৎ বা সাধু কাদেরকে বলা যায়?

উত্তর : যারা ভগবানে চিত্ত সমর্পন করেছেন, যাদের কোন ক্রোধ নেই, সর্বজীবে সমদর্শী, দেহ ও দৈহিক বস্তুতে যাঁরা সমতাশূন্য, যারা নিরহঙ্কার, মান-অপমানে সমতুল্য বুদ্ধি এবং যাঁরা পুত্র-পুত্রাদিতে আসক্তি শূন্য, তাঁরাই সৎ বা সাধু।

প্রশ্ন : ১৮৩৩ ॥ সাধুব্যক্তির মুখে হরিকথা শ্রবনে কি লাভ হবে?

উত্তর : ভগবৎ প্রেম অতি দূর্লভ। ভগবান সহজে কাউকে এই প্রেম দেন না। ভক্তি অথবা মুক্তি দিয়ে বিদায় করতে পারলে আর প্রেম দেন না। এমন দূর্লভ প্রেমও সাধু ব্যক্তির মুখে শ্রীহরিকথা শ্রবণে শীঘ্র লাভ হতে পারে।

প্রশ্ন : ১৮৩৪ ॥ ভগবানের পার্ষদ কারা? তাঁরা কত ধরনের হন?

উত্তর : যাঁরা ভগবানের পরিকররূপে সবসময়ই তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকেন তাঁদেরকে পার্ষদ ভক্ত বলে। পার্ষদ ভক্ত আবার দুই ধরনের হয় : নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ এবং সাধন-সিদ্ধ পার্ষদ। যাঁরা অনাদিকাল থেকেই শ্রীভগবানের পরিকররূপে তাঁর লীলার সহায়তা করছেন, যাঁদেরকে কখনও মায়ার কবলে পতিত হয়ে সংসারে আসতে হয় নাই, তাঁরাই নিত্যপার্ষদ। নিত্য সিদ্ধ পার্ষদদের মধ্যে কেউ কেউ শ্রীভগবানের স্বাংশ বা স্বরূপের অংশ—যেমন সঙ্কর্ষনাদি। আবার কেউ কেউ শ্রীভগবানের শক্তির বিলাস—যেমন ব্রজগোপীগণ। এই সাথে নিত্যসিদ্ধ জীবও

থাকতে পারেন। আর যাঁরা কিছুকাল মায়ামুগ্ধ অবস্থায় সংসার ভোগ করে পরে ভজন-সাধনের প্রভাবে ভগবানের কৃপায় সিদ্ধি লাভ করে ভগবানের পার্ষদ হন, তাঁদেরকে সাধন-সিদ্ধ পার্ষদ বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৮৩৫ ॥ ভগবানের সাধকভক্ত কারা?

উত্তর : ভক্তিরসামৃত সিন্ধু গ্রন্থে (১৪৪) বলা হয়েছে : যাঁরা জাত-রতির ভক্ত, কিন্তু সম্যকরূপে যাঁদের বিঘ্ন-নিবৃত্তি হয় নাই এবং যাঁরা শ্রীকৃষ্ণ সাক্ষাৎকার বিষয়ে যোগ্য তাঁদেরকে সাধক ভক্ত বলে। যেমন শ্রী বিল্বমঙ্গল ঠাকুর। অন্যকথায় যে পর্যন্ত দেহে সাধক অবস্থিত থাকেন, প্রেম লাভ হলেও ঐ পর্যন্তই তাঁদের সীমা তাঁদেরকে সাধক ভক্ত বলা যায়। কারণ তখনও তাঁদের সাধনের দেহ বর্তমান এবং তখন তাঁরা ভগবানের নিত্যলীলার সেবার উপযোগি দেহ পান নাই।

প্রশ্ন : ১৮৩৬ ॥ ভগবানের বিলাসরূপ কি তাঁরই প্রকাশরূপ?

উত্তর : না। কারণ প্রকাশরূপে অঙ্গ, রূপ, গুণ ইত্যাদি ভগবানের মূল স্বরূপের তুল্যই থাকে। কিন্তু তাঁর বিলাসরূপে আকৃতি ও রূপ, গুণ ইত্যাদি মূলস্বরূপ থেকে ভিন্ন থাকে। যেমন শ্রীনারায়ণ ও শ্রীবলরাম ভগবানের বিলাসরূপ। বিলাসে আকার, আকৃতি ও রূপ, গুণ ইত্যাদি ভগবানের প্রকাশ বা মূলরূপের আকার, রূপ ও গুণের মত একইরকম নয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ দ্বিভূজ, অথচ তাঁর বিলাসমূর্ত্তি শ্রীনারায়ণ চতুর্ভূজ শ্রীকৃষ্ণ শ্যামবর্ণ, অথচ তাঁর বিলাসরূপ শ্রীবলদেব সাদাবর্ণের।

প্রশ্ন : ১৮৩৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপের কথা শুনতে পাই। এই সম্পর্কে কিছু উদাহরণ দিতে পারেন কি?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের বিলাসরূপ বহু রয়েছে। তার মধ্যে কয়েকটি উল্লেখ করা হল : শ্রীবলদেব, শ্রীনারায়ণ, সঙ্কর্ষণদেব, অনিরুদ্ধ, প্রদ্যুন্ম, বাসুদেব প্রমুখ হলেন প্রধান।

প্রশ্ন : ১৮৩৮ ॥ ভগবানের চিৎ-শক্তি কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : তিন ধরনের : হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ। যে শক্তি দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ নিজে আনন্দ অনুভব করেন এবং ভক্তদেরকেও আনন্দ দান করেন তাকে হ্লাদিনী শক্তি বলে। যে শক্তি দ্বারা তিঁনি নিজের এবং

সকলের সত্ত্বা রক্ষা করেন তার নাম সন্ধিনী। আবার যে শক্তি দ্বারা তিনি নিজকে জানতে পারেন এবং অন্যদেরকেও জানাতে পারেন তাকে সম্বিৎ শক্তি বলে।

প্রশ্ন : ১৮৩৯ ॥ বৈকুণ্ঠ কি একটি, নাকি একাধিক আছে?

উত্তর : পরব্যোমের মধ্যে অনন্ত ভগবৎ স্বরূপের ধাম আছে। তাঁদের প্রত্যেকের ধামকেই বৈকুণ্ঠ বলে। কাজেই বৈকুণ্ঠের সংখ্যা অনেক।

প্রশ্ন : ১৮৪০ ॥ সব গোপীরাই কি ভগবান শ্রীকৃষ্ণের হ্লাদিনী শক্তির বিলাসরূপ?

উত্তর : না। যেমন যশোদা মাতাও একজন গোপী। কারণ তিনি গোপরাজ নন্দ মহারাজের গৃহিনী। যশোদা মাতা এবং শ্রীকৃষ্ণের মাতৃস্থানীয়া গোপীরা ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সন্ধিনী শক্তির বিলাস, হ্লাদিনী শক্তির বিলাস নন।

প্রশ্ন : ১৮৪১ ॥ গোপী কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : গুপ্‌ ধাতু থেকে গোপী-শব্দের উৎপত্তি। গুপ্‌ ধাতু রক্ষন অর্থে ব্যবহার হয়। তাই গোপী শব্দের সাধারণ অর্থ হল রক্ষাকারিনী। ব্যাপক অর্থে বলা যায় যা কিছু রক্ষণীয় তাই রক্ষা করেন যে রমনীগণ, তাঁদেরকেই গোপী বলা যেতে পারে। এখন যে স্থানে যত কিছু বস্তু আছে সমস্তের আধার বা আশ্রয়ই স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। কাজেই শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের বশে সম্যকরূপে রক্ষা করতে পারেন যে রমনীগণ তাঁরাই গোপী। এককথায় কৃষ্ণ প্রেয়সীগণই হলেন গোপী।

প্রশ্ন : ১৮৪২ ॥ ভাগবতকে শ্রীমদ্‌ ভাগবত বলা হয়। কেন? কারণ এটিতো একটি গ্রন্থ মাত্র।

উত্তর : শ্রীমৎ বা শ্রীমদ্‌ শব্দের অর্থ স্বাভাবিক শক্তি সম্পন্ন। শ্রী ভগবানের নাম, রূপ, গুণ-লীলা ইত্যাদির যেমন স্বাভাবিক অচিন্ত্য শক্তি আছে, ভাগবত গ্রন্থেরও সেই রকম অচিন্ত্য শক্তি আছে বলে নাম হয়েছে শ্রীমদ্‌ ভাগবত।

প্রশ্ন : ১৮৪৩ ॥ ভক্তিশাস্ত্রে দেখা যায় ভক্তদেরকে নাকি নির্মাৎসর হতে হয়। প্রশ্ন হল নির্মাৎসর বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : পরের মঙ্গল বা ভাল যারা সহ্য করতে পারে না তাদেরকে মৎসর বলে। এরূপ মৎসরতা যাদের নাই এবং যাঁরা পরের মঙ্গল বা ভাল দেখলেও হিংসা করেন না বা ক্ষুব্ধ হন না তাদেরকেই নির্মাৎসর বলা হয়। আবার যারা যেকোন কাজ থেকেই ফলের আকাঙ্খী হয় তারাই সাধারণত মৎসর হয়। এজন্য ফলাভিসন্ধান শূন্য ব্যক্তিই নির্মাৎসর হতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৮৪৪ ॥ মোক্ষ বা মুক্তি কত প্রকারের? এই মোক্ষকে নাকি শাস্ত্রে কৈতব প্রধান বলা হয়?

উত্তর : মোক্ষ বলতে সাধারণ কথায় মুক্তি বুঝায়। এই মুক্তি আবার পাঁচ ধরনের হয় : সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, স্বারূপ্য ও সাযুজ্য।

কৈতব শব্দের অর্থ আত্মবঞ্চনা। মোক্ষ প্রাপ্তি হলে জীবের আর পুনর্জন্মের সম্ভাবনা থাকে না। কাজেই প্রেমভক্তি লাভের অনুকূল সাধনের সম্ভাবনা থাকে না। এভাবে দেখা যায় মোক্ষ লাভের বাসনা থাকলে প্রেমভক্তি লাভের সম্ভাবনা চিরতরে দূর হয়ে যায়। এই জন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

ধর্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ বাঞ্ছা আদি সব
তার মধ্যে মোক্ষবাঞ্ছা কৈতব-প্রধান
যাহা হৈতে কৃষ্ণভক্তি হয় অন্তর্দ্ধান ॥

(চৈ. চ. আদি ৫০/৫১)

প্রশ্ন : ১৮৪৫ ॥ পূন্যকর্ম করলেও কি তা কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল হবে?

উত্তর : হ্যাঁ বিশেষ অবস্থায় হবে বৈকি। সাধারণত নিজের সুখের আশায় মানুষ পূন্য কর্ম করে। এখানে আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি বাঞ্ছা থাকে। পূন্যের ফলে, ইহকালে বা পরকালে লোক যখন সুখের অধিকারী হয় তখন সুখ ভোগে মত্ত থেকে শ্রীকৃষ্ণ ভজনের কথা ভুলে যায়। কাজেই

পূণ্যকর্মের আদি ও অন্ত উভয়ই কৃষ্ণভক্তির প্রতিকূল। এজন্যই শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর তাঁর প্রেমভক্তি চন্দ্রিকা বইতে বলেন—

পূন্য যে সুখের ধাম,
না লইও তার নাম,
পাপ-পূন্য দুই পরিহরি।

প্রশ্ন : ১৮৪৬ ॥ সাধন ভক্তি, ভাব ভক্তি এবং প্রেমভক্তি কি?

উত্তর : সাধারণ অবস্থায় যে ভক্তি অঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয় তার নাম সাধন ভক্তি। সাধন ভক্তির পরিণত অবস্থার নাম ভাব-ভক্তি। সাধন-ভক্তি থেকেই ভাব-ভক্তির উদয় হয়। ভাব ভক্তির পরিপক্ক অবস্থার নাম প্রেম বা প্রেমভক্তি।

প্রশ্ন : ১৮৪৭ ॥ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : এই হল ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ রূপ—অর্থাৎ এমন কোন বিশেষ গুণ বা বিশেষণ নাই যা দ্বারা এই স্বরূপের পরিচয় দেয়া সম্ভব। এই স্বরূপটি কেবল ভগবানের চিৎসত্ত্বা মাত্র। এর মধ্যে রূপ-গুণ ও লীলা কিছুই নাই। ভগবানের এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপের নামই ব্রহ্ম। জ্ঞানমার্গের সাধক অদ্বৈতবাদী এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপেরই উপাসক।

প্রশ্ন : ১৮৪৮ ॥ পরমাত্মা সম্পর্কে কিছু জানতে চাই।

উত্তর : সাধারণ কথায় জীবদেহে অর্ন্তযামীরূপে ভগবানের যে রূপ অবস্থান করেন তাকে পরমাত্মা বলা হয়। অর্ন্তযামী তিন ধরনের। সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডের অর্ন্তযামী (কারণবারী সাগরে সহস্র শীর্ষা পুরুষ); ব্যষ্টি-ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মার অর্ন্তযামী (গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু বা পুরুষ) এবং ব্যষ্টি জীবের অর্ন্তযামী (ক্ষীরোদশায়ী চতুর্ভূজ বিষ্ণু বা পুরুষ)। এঁরা সবাই সবিশেষ, রূপ-গুণ বিশিষ্ট। তাঁরা সবাই ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ প্রকাশ। তাই চিৎ-শক্তি বিশিষ্ট।

প্রশ্ন : ১৮৪৯ ॥ উপনিষদ কি ধরনের শাস্ত্র এবং কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : উপনিষদ হল শ্রুতি শাস্ত্র। এই শাস্ত্রে পরমার্থ সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। শ্রুতি বা উপনিষদ মূলতঃ দুই ধরনের। এক

ধরনের শ্রুতি শাস্ত্রে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ এবং অন্য এক শ্রেণীর শ্রুতিশাস্ত্রে সবিশেষ ব্রহ্মের বিবরণ আছে। জ্ঞানমার্গের অদ্বৈতবাদিগণ নির্ব্বিশেষ শ্রুতির বিশেষ সমাদর করেন। আর ভক্তিমার্গের উপাসকরা অপর শ্রুতিশাস্ত্রের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

প্রশ্ন : ১৮৫০ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে মূল নারায়ণ বলা হয় কেন?

উত্তর : নার এবং অয়ন এই দুই শব্দের সমন্বয়ে নারায়ণ শব্দ পাওয়া যায়। নার শব্দের অর্থ জীবসমূহ—অর্থাৎ সমস্ত জীবগণ। আর অয়ন শব্দের অর্থ আশ্রয়। কাজেই নার—অর্থাৎ জীবসমূহের আশ্রয় যাঁর তিনিই নারায়ণ। পরমাত্মারূপে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রতিটি জীবের মধ্যেই অবস্থান করছেন। সুতরাং নার বা জীবসমূহ পরমাত্মার আশ্রয় বা অয়ন বলে পরমাত্মাই নারায়ণ এবং শ্রীকৃষ্ণই পরমাত্মার মূল বলে তিঁনিই মূল নারায়ণ।

প্রশ্ন : ১৮৫১ ॥ শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে কোন পার্থক্য আছে কি?

উত্তর : স্বরূপ শ্রীনারায়ণ ও শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে স্বরূপতঃ কোন পার্থক্য নাই। কিন্তু আকারে পার্থক্য আছে। যেমন শ্রীকৃষ্ণের দুই হাত কিন্তু নারায়ণের চার হাত। শ্রীকৃষ্ণের হাতে বেনু থাকে। নারায়নের হাতে শঙ্খ, চক্র, গদা ও পদ্ম আছে। এজন্য শ্রীনারায়ণ হলেন শ্রীকৃষ্ণের বিলাস মূর্ত্তি। শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

সেই নারায়ণ—কৃষ্ণের স্বরূপ-অভেদ।
একই বিগ্রহ, কিন্তু আকার-বিভেদ ॥
ইহোত্ত দ্বিভূজ, তিঁহো ধরে চারিহাথ।
ইহো বেনু ধরে, তিহো চক্রাধিক সাথ ॥
(চৈ. চ. আদি ২/২০-২১)

প্রশ্ন : ১৮৫২ ॥ ব্রহ্মা একসময় শ্রীকৃষ্ণকে অধীশ বলে সম্বোধন করেছিলেন। এই অধীশ বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : অধীশ বলতে ঈশ্বরসমূহের অধিপতি বা প্রবর্ত্তক বুঝায়। কারণার্নবশায়ী বিষ্ণু, গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু এবং ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু—এই

তিন পুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত জীবসমূহের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের অব্যহিত কারণ। কাজেই এই তিন পুরুষই ব্রহ্মাণ্ডের এবং জীবসমুহের ঈশ্বর। আবার শ্রীকৃষ্ণ থেকেই এই তিন পুরুষের উদ্ভব, শ্রীকৃষ্ণই তাঁদের প্রবর্ত্তক বা অধীশ্বর। এজন্যই উক্ত ঈশ্বরসমূহের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণই হলেন অধীশ।

প্রশ্ন : ১৮৫৩ ॥ শ্রীনারায়ণ যদি শ্রীকৃষ্ণের আশ্রিতই হন তাহলে কেউ কেউ শ্রীকৃষ্ণকে নারায়ণের অবতার বলেন কেন?

উত্তর : আশ্রয়বস্তু কখনো আশ্রিতের অবতার হতে পারেন না। কারণ আশ্রিত অপেক্ষা আশ্রয়েরই প্রাধান্য থাকে। যারা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ তত্ব জানেন না, তারাই শ্রীকৃষ্ণের শক্তি তত্ত্বও জানেন না, তারাই ঐরূপ অপসিদ্ধান্ত করে থাকেন। যাঁরা শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপের ও তাঁর শক্তির তত্ব জানেন তাঁরা কখনো এরূপ অপসিদ্ধান্ত মানবেন না।

প্রশ্ন : ১৮৫৪ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : স্বয়ং রূপ ছাড়াও ভগবান শ্রীকৃষ্ণ আরও ছয় রূপে বিরাজ করেন। এই ছয় রূপ হল : প্রাভব, বৈভব, অংশ, শক্ত্যাবেশ, বাল্য ও পৌগণ্ড। যেমন রাসলীলায় এবং বিবাহকালে প্রকটিত শ্রীকৃষ্ণের বহু মূর্ত্তি তাঁর প্রার্ভাব প্রকাশ এবং শ্রীবলরাম তাঁর বৈভব প্রকাশ। দ্বারকায় যখন শ্রীকৃষ্ণ চতুর্ভূজ হন তখন তিনি বৈভব বিলাস। আবার ভগবান যখন স্বয়ংরূপের সাথে অভিন্ন থেকে বিলাস অপেক্ষা অল্প শক্তি প্রকাশ করেন তখন তাকে অংশ প্রকাশ বলে। যেমন মৎস অবতার। পক্ষান্তরে ভগবান যেসব উত্তম জীবে আবিষ্ট হয়ে থাকেন তাদেরকে শক্ত্যাবেশ অবতার বলে। যেমন শ্রীল ব্যাসদেব, সনকাদি মুনিগণ ইত্যাদি। ভগবানের পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত সময়কে বাল্য এবং পাঁচ থেকে দশ বছর পর্যন্ত সময়কে পৌগণ্ড বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৮৫৫ ॥ ভগবানের চিচ্ছক্তি কি?

উত্তর : চিচ্ছক্তি কে ভগবানের স্বরূপ শক্তি এবং অন্তরঙ্গা শক্তিও বলা হয়। কাজেই এর তিনটি নাম। চিৎ + শক্তি = চিচ্ছক্তি। চিৎ অর্থ

চেতন। তাই চিচ্ছক্তি হল চেতনাময়ী শক্তি। চেতনাময়ী বলে এর নিজের কর্তৃত্ব এবং পরিনামশীলতা আছে। এই শক্তি সবসময় ভগবৎ স্বরূপে অবস্থিত থাকে। ফলে একে ভগবানের স্বরূপস্থিত শক্তি বা স্বরূপ শক্তি বলা হয়। এই শক্তিই ভগবৎস্বরূপের মধ্যে থেকে ভগবানকে নিজের স্বরূপের আনন্দ অনুভব করায়।

প্রশ্ন : ১৮৫৬ ॥ মায়ার সাথে যখন কোনরূপ সংযোগ নাই তখন মায়া যে ভগবৎ শক্তি তার প্রমাণ কি?

উত্তর : গীতায় শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলেছেন যে মায়া তাঁর অন্যতম শক্তি। **"দৈবী হ্যেষা গুনময়ী মম মায়া দুরত্যয়া"** (গীতা ৭/১৪)। আরও প্রমান এই যে সৃষ্টি-প্রকরণ থেকে জানা যায় ঈশ্বরের শক্তির প্রভাবেই মায়া তার কার্য্য—অর্থাৎ সৃষ্টিকার্য্য নির্বাহ করে। এথেকেও বুঝা যায় মায়া ভগবানের আশ্রিতা শক্তি। কাজেই ভগবানেরই শক্তি।

প্রশ্ন : ১৮৫৭ ॥ মায়া কত ধরনের এবং কি কি?

উত্তর : মায়া দুই ধরনের : গুণমায়া এবং জীব মায়া। সত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিন গুণের সাম্যরূপা প্রকৃতিকে গুণমায়া বলে। আর মায়ার যে বৃত্তি জীবের স্বরূপকে আবৃত রেখে আমি, আমার ইত্যাদি জ্ঞান সৃষ্টি করে তাকে বলে জীবমায়া। জীবমায়ার দুই রকম শক্তি। আবরানাত্মিকা এবং বিক্ষেপাত্মিকা। যে শক্তি দ্বারা জীবমায়া জীবের স্বরূপকে আবৃত করে তাকে বলে আবরানাত্মিকা শক্তি। এই জীবমায়াই গুণমায়াকে উজ্জীবিত করে।

প্রশ্ন : ১৮৫৮ ॥ মায়াকে কোন্ অর্থে জগত কারণ বলা হয়?

উত্তর : কারণ দুই রকমের হয় : নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ। যে ব্যক্তি কোন বস্তু তৈরী করে তাকে বলে ঐ বস্তুর নিমিত্ত কারণ। আর যে দ্রব্য দ্বারা ঐ বস্তুটি তৈরী হয়, তাকে বল ঐ বস্তুর উপাদান কারণ। যেমন কুমার মাটী দ্বারা ঘট তৈরী করে। এখানে কুমার হল ঘটের নিমিত্ত কারণ। আর মাটী হল ঘটের উপাদান কারণ। মায়াও বিশ্বের কারণ—গুণমায়া উপাদান কারণ এবং জীবমায়া নিমিত্ত কারণ। তবে মনে রাখতে হবে মায়া বিশ্বের গৌণ কারণ মাত্র, মুখ্য কারণ নয়। কারণ ভগবানের শক্তিতেই মায়া বিশ্ব সৃষ্টি করতে পারে মাত্র।

প্রশ্ন : ১৮৫৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণের এক নাম গোবিন্দ। এই নামের অর্থ বা তাৎপর্য্য কি?

উত্তর : গো-অর্থ গরু বা পৃথিবী। আর বিন্দ-ধাতুর অর্থ পালন। কাজেই গো-পালন করেন যিনি তিনি গোবিন্দ। ব্রজলীলায় কৃষ্ণ গোচারণ করেছেন বলে তাঁকে গোবিন্দ বলা হয়।

আর ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালনের কর্তা বলেও তিনি গোবিন্দ। আবার গো-অর্থ ইন্দ্রিয়ও হয়। শ্রীকৃষ্ণ সব ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতা হওয়ায় তিনি গোবিন্দ—হৃষীকেশ। পক্ষান্তরে অনেকে বলেন অন্তরঙ্গ পরিকরগণের ইন্দ্রিয়সমূহকে তাদের স্ব স্ব বিষয়ে আনন্দ দ্বারা পালন বা পোষণ করেন বলেও তিনি গোবিন্দ।

প্রশ্ন : ১৮৬০ ॥ আমরা জানি কৃষ্ণ হলেন ব্রজেন্দ্র নন্দন। আবার তিনি মথুরার অধিপতি এবং দ্বারকাধীশ মাত্র। এখন প্রশ্ন এদের মধ্যে কোন্ কৃষ্ণ চৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হয়েছেন?

উত্তর : ব্রজেন্দ্র নন্দন কৃষ্ণ স্বয়ং শ্রীচৈতন্য রূপে অবতীর্ণ হয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের অপর কোন স্বরূপ শ্রীচৈতন্য রূপে আসেন নাই।

শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

সেই কৃষ্ণ অবতারী ব্রজেন্দ্র কুমার।
আপনে চৈতন্যরূপে কৈল অবতার ॥

(চৈ. চ. আদি ২/৯১)

প্রশ্ন : ১৮৬১ ॥ গোকুল কোথায় অবস্থিত? সেখানে কে কে থাকেন?

উত্তর : পরব্যোমের উপরে সহস্রদল পদ্মের আকৃতির মত একটি ধাম আছে। তার নাম গোকুল। এই পদ্মের কর্ণিকার স্থলে শ্রীকৃষ্ণের মহদন্তঃপুর। এই অন্তঃপুরে নন্দ-যশোদাদি ও শ্রীরাধিকাদি-কান্তাগণের সাথে শ্রীকৃষ্ণ বাস করেন। শ্রীকৃষ্ণের পরম প্রেমভাজন গোপগণ উক্ত পদ্মের কিঞ্জল্কস্থানে বাস করেন। আর গোপসুন্দরীদের উপবন হল এই পদ্মের পত্রাদি। একে কেলিবৃন্দাবনও বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৮৬২ ॥ গোকুল, গোলোক এবং বৃন্দাবন কি একই?

উত্তর : পরব্যোমের উপরে সহস্রদল পদ্মাকৃতির যে ধাম আছে তাকে বলে গোকুল। গোকুলের বাইরের চারপাশে বৃন্দাবন এবং বৃন্দাবনের বাইরের চারপাশে শ্বেতদ্বীপ গোলোক অবস্থিত। গোকুলকে ব্রজও বলা হয়। গোকুলের শেষ সীমায় উপবনগুলিকে কেলিবৃন্দাবন বলে। যাই হোক গোকুলের বিভিন্ন সীমা নির্দিষ্ট থাকলেও কেউ কেউ এই তিন নামে এক শ্রী গোকুল ধামকেই অভিহিত করেন। কারণ অপ্রকট লীলায় ব্রজেন্দ্র নন্দন এই তিনধামেই লীলা করেন। গো-গোপাবাস বলে এই তিন স্থানকেই গোলোক বলা যায়।

প্রশ্ন : ১৮৬৩ ॥ ভগবানের প্রকটের নিয়ম কিরূপ?

উত্তর : ভগবানের প্রকটের নিয়ম এই যে, প্রথমে তাঁর ধাম প্রকটিত হয়। তারপর মাতা-পিতা গুরু স্থানীয় পরিকরবর্গ প্রকটিত হন। এরপর ভগবান জন্মাদি-লীলার সঙ্গে তিনি নিজেকে প্রকটিত করেন। এইরূপে ব্রহ্মার একদিনে (বিষ্ণু পুরান মতে ৪৩২ কোটি বছরে) ভগবান শ্রীকৃষ্ণ একবার এক ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়ে লীলা বিস্তার করেন।

প্রশ্ন : ১৮৬৪ ॥ ব্রজভাব কি?

উত্তর : ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ভাবকে ব্রজভাব বলা যায়। ব্রজ ছাড়া অন্য কোন ধামে এই ভাব দেখা যায় না। ব্রজের দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর এই চারটি ভাবের যেকোন ভাবকেও ব্রজভাব বলা হয়। এই চার ভাবের ভক্তদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই। শ্রীকৃষ্ণকে তাঁরা নিতান্ত আপনার জন বলে মনে করেন এবং এই ভাবের ভিত্তিতে কৃষ্ণের প্রীতির জন্য সেবা করেন। সেবায় নিজেদের সুখ-বাসনার গন্ধমাত্রও নাই।

প্রশ্ন : ১৮৬৫ ॥ ভগবানকে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যারা বিধি-ভক্তির অনুষ্ঠান করেন তাদের ভজন কি বৃথা হয়?

উত্তর : না, তাদের ভজন বৃথা হয় না। ব্রজের ভাবে তারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে পারেন না বটে, কিন্তু সালোক্য, সামীপ্য ইত্যাদি চার ধরনের মুক্তির কোন একটি পেয়ে তাঁরা বৈকুণ্ঠ ধাম লাভ

করতে পারেন। তাদের ভজন ঐশ্বর্য্যপূর্ণ বলেই ঐশ্বর্য্য প্রধান বৈকুণ্ঠে তাদের গতি হয়।

প্রশ্ন : ১৮৬৬ ॥ সারূপ্য মুক্তি কি?

উত্তর : সারূপ্য শব্দের অর্থ সমান রূপ পাওয়া। যিনি ভগবানের যে স্বরূপের উপাসক তিনি যদি সেই স্বরূপের ধামে স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হন তবে তাকে সারুপ্য মুক্তি বলে। যেমন নারায়ণের উপাসক যদি চতুর্ভূজ মূর্ত্তি লাভ করেন, নৃসিংহের উপাসক যদি নৃসিংহের মত রূপ পান তাহলে এরূপ মুক্তিকে বলে সারূপ্য।

প্রশ্ন : ১৮৬৭ ॥ সাযুজ্য মুক্তি কি? এর কি প্রকারভেদ আছে?

উত্তর : ভগবানের স্বরূপের সাথে মিলিত হওয়ার নাম সাযুজ্য মুক্তি। তবে এখানে জীব ভগবানের সাথে অভেদত্ব লাভ করে না। সাযুজ্য মুক্তি আবার দুই প্রকার : ব্রহ্ম সাযুজ্য এবং ঈশ্বর সাযুজ্য। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাথে যারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় তাদের মুক্তিকে বলে ব্রহ্ম সাযুজ্য। আর ভগবানের কোন এক সবিশেষ স্বরূপের (যেমন নারায়ণ, নৃসিংহ ইত্যাদি) সাথে যারা সাযুজ্য প্রাপ্ত হয় তাদের মুক্তিকে বলে ঈশ্বর সাযুজ্য।

প্রশ্ন : ১৮৬৮ ॥ যুগধর্ম বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : যুগের উপযোগি সাধন-ধর্মকেই যুগধর্ম বলা হয়। এক এক যুগের সাধন-ধর্ম এক এক রকম হয়। যেমন সত্য যুগের সাধন ধ্যান, ত্রেতার সাধন যজ্ঞ, দ্বাপরের সাধন পরিচর্য্যা এবং কলিযুগের সাধন সংকীর্তন।

প্রশ্ন : ১৮৬৯ ॥ বর্ণসঙ্কর কাদেরকে বলা যায়?

উত্তর : ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই হল চারটি বর্ণ। সঙ্কর শব্দের অর্থ হল মিশ্রণ। একবর্ণের ভ্রষ্টা স্ত্রীতে অপর বর্ণের পরপুরুষ দ্বারা অবৈধভাবে যে সন্তান উৎপন্ন হয় তাকে বর্ণসঙ্কর বলে।

প্রশ্ন : ১৮৭০ ॥ ভগবানের এক নাম পদ্মনাভ। কেন এরূপ নাম হয়েছে?

উত্তর : পদ্মের ন্যায় সুন্দর ও সুগন্ধি নাভি যার তিনিই পদ্মনাভ। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এরূপ নাভি থাকায় তাঁকে পদ্মনাভও বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৮৭১ ॥ শ্রীরামচন্দ্র যখন বনে গমন করেছিলেন তখন তার জন্য বৃক্ষ, পশু, পক্ষী ইত্যাদিও রোদন (কান্না) করেছিল বলে রামায়ণে দেখা যায়। এতে বুঝা যায় শ্রীরামচন্দ্রের প্রতি বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষীরও প্রেম জন্মেছিল, শ্রীরাম এদেরকেও প্রেম দিয়েছিলেন। নতুবা এরা তার জন্য রোদন করবে কেন। প্রশ্ন হল কেবল কৃষ্ণই সমস্ত জীবকে প্রেম দিতে পারেন, অন্য কেউ পারেন না, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়?

উত্তর : শ্রীরামচন্দ্রের জন্য বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষী ইত্যাদি যে কান্না করেছিল তা সত্য। কিন্তু তা কেবল শ্রীরামচন্দ্রের বন-গমন সময়ে, তাঁর বিচ্ছেদে এবং দুঃখে কাতর হয়ে। সবসময়ই শ্রীরামচন্দ্রের সাথে সংযোগ সময়ে বৃক্ষ-লতা, পশু-পক্ষীর ঐরূপ আচরণ দেখা যায় না। কিন্তু কৃষ্ণের সাথে মিলন বা সংযোগ সময়েও প্রতিদিনই পশু-পক্ষী, বৃক্ষ-লতা ইত্যাদির দেহে প্রেমবিকার পরিলক্ষিত হয়। কাজেই কৃষ্ণ ছাড়া যুগোত্তর অপর কোন ভগবৎ স্বরূপ সব জীবকে সবসময় প্রেম দিতে পারেন নাই।

প্রশ্ন : ১৮৭২ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভু কলির প্রথম সন্ধ্যায় আবির্ভূত হন। প্রশ্ন হল কলিযুগের সন্ধ্যা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : প্রতিটি যুগের প্রথম নির্দিষ্ট সংখ্যক কয়েক বছরকে ঐ যুগের সন্ধ্যা বলে। কলিযুগের প্রথম ৩৬০০০ বছরকে (মনুষ্যমানে) কলির সন্ধ্যা বলে। এই সন্ধ্যার প্রথমভাগে শ্রীমন্ মহাপ্রভু আবির্ভূত হয়েছিলেন।

প্রশ্ন : ১৮৭৩ ॥ শ্রীমন্ মহাপ্রভুর এক নাম বিশ্বম্ভর। এর তাৎপর্য কি?

উত্তর : বিশ্বং ভরতি ইতি বিশ্বম্ভর : অর্থাৎ সমগ্র বিশ্ববাসীকে যিনি ভরণ করেন তিনিই বিশ্বম্ভর। ভূ-ধাতুর অর্থ পোষণ ও ধারণ। ভক্তির রস দ্বারা বিশ্ববাসী জীবকে পোষণ ও ধারণ করেছেন বলেই প্রভুর নাম বিশ্বম্ভর।

প্রশ্ন : ১৮৭৪ ॥ মহাপ্রভুর শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নামের তাৎপর্য কি?

উত্তর : শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে অচৈতন্য জীবের চৈতন্য সম্পাদন করান—অর্থাৎ কৃষ্ণতত্ত্ব সম্পর্কে জ্ঞান দান করেন। এইজন্য তার নাম হয় শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য। শ্রীপাদ কেশব ভারতীর মুখেই এই নাম সর্বপ্রথম উচ্চারিত হয়।

প্রশ্ন : ১৮৭৫ ॥ গর্গমুনি যিনি ভগবানের নামকরণ করেছিলেন তার সম্পর্কে জানতে চাই।

উত্তর : অতি সংক্ষেপে বলা হল : তিনি একজন মুনি এবং আচার্য্য ছিলেন। ইনি বসুদেবের কুলপুরোহিত ছিলেন। জ্যোতিষশাস্ত্রে বিশেষভাবে পারদর্শী ছিলেন। বসুদেবের অভিপ্রায়ে তিনি গোকুলে এসে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ করেছিলেন।

প্রশ্ন : ১৮৭৬ ॥ শ্রীচৈতন্য অবতারে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ হলেন কেন?

উত্তর : ব্রজপ্রেম দিতে হবে—এই কারণে শ্রীচৈতন্য অবতারে শ্রীকৃষ্ণ পীতবর্ণ ধারণ করেন। ব্রজপ্রেম দেওয়ার জন্য পীতবর্ণ হওয়ার আবশ্যকতা এই যে, প্রেমের অধিকারিনী হলেন গৌরাঙ্গী শ্রীরাধা। তাঁর ভাব এবং কান্তি অঙ্গীকার না করলে ব্রজপ্রেম দেওয়া যায় না। তাই শ্রীকৃষ্ণ তাঁর ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে গৌর (পীত) বর্ণ ধারণ করেন।

প্রশ্ন : ১৮৭৭ ॥ শাস্ত্রে বলা হয়েছে এককল্পে বা ব্রহ্মার একদিনে ভগবান একবার মাত্র লীলা প্রকটিত করেন। কিন্তু আমরা দেখি বর্তমান কল্পের অন্তর্গত একই চতুর্যুগের মধ্যে দ্বাপরে একবার শ্যাম সুন্দররূপে এবং তার পরের কলিতেই একবার গৌর সুন্দররূপে ভগবান অবতীর্ণ হলেন। এই অবস্থার কোন ব্যাখ্যা আছে কি?

উত্তর : শ্রীবৃন্দাবন লীলা ও নবদ্বীপ লীলা দুইটি পৃথক লীলা নয়। স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দনের একই লীলা প্রবাহের দুইটি অংশ মাত্র। বৃন্দাবন লীলা পূর্বাংশ এবং নবদ্বীপ লীলা উত্তরাংশ। যে উদ্দেশ্য অর্জনের অভিপ্রায়ে স্বয়ং ভগবান লীলা প্রকট করেন তার আরম্ভ ব্রজে এবং পূর্ণতা নবদ্বীপে।

ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ লীলা দুইটি পৃথক লীলা নয় বলে দ্বাপরের অবতার এবং কলির অবতারও দুইটি পৃথক অবতার নন—একই অবতারের দুইটি অবয়ব মাত্র। কারণ শ্রীগৌরসুন্দর শ্রীশ্যামসুন্দরের আবির্ভাব বিশেষ। একইভাবে রাধাভাব দ্যুতি সুবলিত শ্রীকৃষ্ণ রূপ গৌরসুন্দরও ব্রজেন্দ্রনন্দন থেকে ভিন্ন অবতার নন, ব্রজেন্দ্র নন্দনেরই আবির্ভাব—বিশেষ মাত্র। কাজেই একই কল্পে স্বয়ং ভগবানের দুইবার অবতরনের আশঙ্কা নাই।

প্রশ্ন : ১৮৭৮ ॥ ভগবানের ব্রজে শ্রীকৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হয়ে পরের কলিযুগের আরম্ভেই আবার গৌররূপে আবির্ভাবের হেতু কি?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার একটি উদ্দেশ্য ছিল—রাগমার্গের ভক্তি প্রচার করা। কিন্তু যে প্রেম দ্বারা ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করতে হয়—সেই প্রেম তিনি জীবকে দিতে পারেন নাই। কারণ দ্বাপর—লীলায় প্রেমের মূল ভাণ্ডার তাঁর হাতে ছিল না। এতে শ্রীরাধারানীর ছিল পূর্ণ অধিকার। সেই প্রেম জীবকে দান করার জন্য শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করে শ্রীকৃষ্ণ পীত বর্ণ ধারণ করে গৌররূপে কলিযুগে অবতীর্ণ হন।

প্রশ্ন : ১৮৭৯ ॥ পাণ্ডবরা অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছিলেন। এই অশ্বমেধ যজ্ঞ আসলে কি?

উত্তর : এক প্রকার বিশেষ যজ্ঞ। প্রথমত, বিশেষ লক্ষণ যুক্ত একটি অশ্বকে পবিত্র জলদ্বারা স্নান করানো হয়। তারপর অশ্বের কপালে একটি জয়পত্র বেঁধে ছেড়ে দেওয়া হয়। এই অশ্ব রক্ষার জন্য এর পেছনে সৈন্য দল থাকে। একবছর পর্যন্ত অশ্বটি ইচ্ছামত যেখানে সেখানে ভ্রমণ করতে থাকে। এই সময় অন্য কেউ অশ্বটিকে আবদ্ধ করে রাখলে তাকে যুদ্ধের মাধ্যমে পরাজিত করে অশ্ব উদ্ধার করা হয়। এক বছর অতিক্রান্ত হলে অশ্বকে আবার নিজের রাজ্যে ফিরিয়ে আনা হয়। এরপর যথাবিধি নিয়মে তাকে বধ করে শরীর দ্বারা হোম করা হয়। সংক্ষেপে এই হল অশ্বমেধ যজ্ঞ।

অশ্বমেধ যজ্ঞ হল বেদের কর্মকাণ্ডের বিধান। এই যজ্ঞের ফল সম্পর্কে পদ্মপুরাণের পাতালখণ্ড থেকে জানা যায় : অগস্ত্য মুনি

শ্রীরামচন্দ্রকে বলছেন, যথাবিধি অশ্বমেধ যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হলে সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

প্রশ্ন : ১৮৮০ ॥ এই জগতে মূলত কত রকমের সৃষ্টি আছে?

উত্তর : মূলতঃ দুই ধরনের সৃষ্টি আছে : দৈব এবং আসুরী। যাঁরা বিষ্ণুভক্ত তাঁরা দৈব সৃষ্টি। আর যারা এর বিপরীত—অর্থাৎ বিষ্ণু ভক্তিবিহীন তারা আসুর সৃষ্টি।

প্রশ্ন : ১৮৮১ ॥ শ্রীকৃষ্ণের পৃথিবীতে অবতরনের প্রকার কিরূপ?

উত্তর : ভগবান যখন প্রাকৃত জগতে অবতরণ করেন তখন তাঁকে অবতার বলা হয়। ভগবান দুই প্রকারে অবতীর্ণ হন।

১. মানুষের ন্যায় পিতামাতার যোগে আবির্ভূত হন। এইরূপ অবতরণকে সদ্বারক বলে। কারণ এক্ষেত্রে পিতামাতা হলেন অবতারের দ্বার। যেমন রাম, কৃষ্ণ, গৌরাঙ্গ।

২. পিতামাতার অপেক্ষা না রেখে আপনা-আপনি অবতীর্ণ হন। যেমন মৎস-কূর্ম, বরাহ, নৃসিংহ ইত্যাদি হলেন অদ্বারক অবতার।

ভগবান যখন নরলীলা প্রকট করেন তখন পিতামাতার যোগে মানুষের ন্যায় জন্মাদি লীলা প্রকট করেন। তবে এখানে ভগবানের যারা পিতামাতা হন তারা মানুষ নন। তারা ভগবানের সন্ধিনী শক্তি। অনাদিকাল থেকেই তাঁরা ভগবানের পিতামাতারূপে বিরাজ করেন।

প্রশ্ন : ১৮৮২ ॥ তুলসী মঞ্জরী আসলে কি? এর দ্বারা ভগবানকে পুজা করলে নাকি তিনি অতিশয় প্রীত হন?

উত্তর : তুলসীর কোমল বীজ-মুকুলকে মঞ্জরী বলে। শ্রীকৃষ্ণের পুজার জন্য মঞ্জরী চয়নকালে কোমল মঞ্জরীর দুই পাশের দুইটি কচিপাতাসহ চয়ন করতে হয়। এইভাবে আটটি মঞ্জরী চয়ন করে ভগবানের পাদপদ্মে শ্রদ্ধা সহকারে অর্পন করতে হয়। শ্রীমন্ মহাপ্রভু গোবর্দ্ধন শিলার অর্চ্চন সম্পর্কে শ্রীলরঘুনাথ দাস গোস্বামীকে একই কথা উপদেশ দিয়েছিলেন—

"দুই পাশে দুইপত্র মধ্যে কোমল মঞ্জরী।
এই মত অষ্ট মঞ্জরী দিবে শ্রদ্ধা করি ॥"

প্রশ্ন : ১৮৮৩ ॥ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের চরণে তুলসী দেয়ার সময় ভক্তের মনে কিভাব থাকা উচিত?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ চরণে তুলসী প্রদানের সময়—শ্রীকৃষ্ণচরণ চিন্তা করে—যেন শ্রীকৃষ্ণচরণ-সান্নিধ্যে উপস্থিত থেকেই সাক্ষাৎভাব চরণে তুলসী দেয়া হচ্ছে—এরূপ মনে করে তুলসী দিতে হবে। অন্যান্য উপাচার অর্পনের সময়ও একই চিন্তা করতে হবে। বাস্তবিক এরূপ চিন্তা না থাকলে সাক্ষাৎ-ভজনে প্রবৃত্তি বুঝায় না। একেই সাসঙ্গ ভজন বলে। আর সাক্ষাৎ-ভজনে প্রবৃত্তিবিহীন ভজনকে অনাসঙ্গ ভজন বলে। ভক্তিরসামৃত সিন্ধু বলেন, হাজার হাজার অনাসঙ্গ সাধন দ্বারাও হরিভক্তি পাওয়া যায় না।

প্রশ্ন : ১৮৮৪ ॥ যোগমায়ার সাথে কৃষ্ণের সম্পর্ক কি?

উত্তর : কৃষ্ণলীলার সহায়কারিনী শক্তির—অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ইনিও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি, শুদ্ধ সত্ত্বের পরিণতি—বিশেষ। তিনি অঘটন—ঘটন পটিয়সী—অর্থাৎ যা অন্যের পক্ষে অসম্ভব, এরূপ ঘটনাও তিনি তাঁর অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সম্পন্ন করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৮৮৫ ॥ অপ্রকট বৃন্দাবনে ভগবান পরকীয়া রস আস্বাদন করেন কি? না করলে কেন পারেন না?

উত্তর : উপপতিভাবের জন্য নায়িকার পরকীয়াত্ব প্রয়োজন। অর্থাৎ নায়িকা কৃষ্ণের ধর্মপত্নী নন, অপরের ধর্মপত্নী অথবা অন্যের কুমারী কন্যা—এরূপ জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। এজন্য ধর্মপতির অথবা পিতামাতার ঘরেই নায়িকার অবস্থান দরকার। শ্রীকৃষ্ণ এবং গোপীদের একই গৃহে অবস্থান উপপতি-ভাবের অনুকূল নয়। অপ্রকট বৃন্দাবনে (গোলোকে) নন্দ-যশোদা এবং গোপীদের সাথে শ্রীকৃষ্ণ একই গৃহে (সহস্রদল পদ্মের কর্ণিকার স্থানীয় মহদন্তঃ পুরে) নিত্য অবস্থান করেন। গোপীরা কৃষ্ণেরই হ্লাদিনী শক্তি। এরা শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া বা নিজের শক্তি। কাজেই তাঁরা শ্রীকৃষ্ণের নিজের কান্তা। কাজেই অপ্রকট বৃন্দাবনে গোপীদের অন্যের সাথে ধর্ম বিবাহ বা অন্যগৃহে অবস্থান সম্ভব নয়। এজন্যই গোলোকে ভগবান পরকীয়া রস আস্বাদন করেন না।

প্রশ্ন : ১৮৮৬ ॥ ভগবানের লীলা বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : আনন্দের প্রেরণায়, আনন্দের উচ্ছাসে, আনন্দঘন-বিগ্রহ-শ্রীভগবানের আনন্দবিগ্রহ-পরিকরগণের সাথে আনন্দময়ী খেলার নামই লীলা।

প্রশ্ন : ১৮৮৭ ॥ আজকাল দেখি অনেক জায়গায় একনাম সংকীর্তনের পর গায়ক-গায়িকারা মিলে ভগবানের রাসলীলা দেখান। একি ঠিক?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতে (১০/৩৩/৩০) শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলেন, শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেউ (বাক্য বা কর্মের দ্বারা দূরের কথা) মনেও রাসাদি লীলার একাংশেরও আচরণ করবে না। রুদ্র (শিব) ছাড়া অন্য কেউ অজ্ঞতাবশত সমুদ্রের বিষ পান করলে যেমন তৎক্ষণাৎ বিনাশপ্রাপ্ত হয়, মূঢ়তা বশত কোন জীব ঈশ্বরের আচরণের অনুকরণ করলে সেইরূপ বিনাশ প্রাপ্ত হবে। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী বলেন, শৃঙ্গার রসের কথা তো দূরে, অন্য কোন রসেও শ্রীকৃষ্ণের ভাব অনুকরণীয় নয়।

প্রশ্ন : ১৮৮৮ ॥ শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে দেখি রাধিকা হলেন কৃষ্ণের প্রণয়-বিকার। এই প্রণয়-বিকার বলতে কি বুঝানো হয়েছে?

উত্তর : প্রণয় বলতে প্রেম বুঝায়। আর বিকার শব্দ দ্বারা পরিণতি বা ঘনীভূত অবস্থা বুঝায়। প্রেমের বিকার বা চরম পরিণতির নাম মহাভাব। শ্রীরাধিকা হলেন এই মহাভাব-স্বরূপিনী। তাই শ্রীরাধাকে কৃষ্ণপ্রেমের বিকার বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৮৮৯ ॥ শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীরাধার মধ্যে কি কোন ভেদ আছে?

উত্তর : শ্রীরাধা হলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ শক্তি। আর শ্রীকৃষ্ণ হলেন শক্তিমান। স্বরূপশক্তি স্বরূপ থেকে অভিন্ন বলে—অর্থাৎ শক্তি ও শক্তিমান অভেদ হওয়ায় শ্রীরাধা ও শ্রীকৃষ্ণে কোন ভেদ নাই। কেবলমাত্র লীলারস আস্বাদনের সময় তাঁরা দুই রূপ ধারণ করেন।

প্রশ্ন : ১৮৯০ ॥ শ্রীরাধাতো কৃষ্ণের শক্তি। শক্তিরতো কোন মূর্ত্তি থাকতে পারে না। তাহলে কি করে শ্রীরাধার মূর্ত্তি বা বিগ্রহ আছে?

উত্তর : শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তার ভগবৎ সন্দর্ভ গ্রন্থে বলেন : শক্তিসমূহ কেবল শক্তিরূপে অমূর্ত্ত। এই অমূর্ত্ত শক্তি ভগবানের বিগ্রহে একাত্ম হয়ে অবস্থান করে। ঐ সময় তাদের পৃথক বিগ্রহ থাকে না। কিন্তু ঐ শক্তির অধিষ্ঠাত্রীরূপে তাদের মূর্ত্তি বা বিগ্রহ থাকে। এই বিগ্রহরূপ শক্তিসমূহ ভগবানের আবরণ বা পরিকর স্বরূপ। এই ভাবে শক্তির দুইরূপে অবস্থিতি—মূর্ত্ত এবং অমূর্ত্ত। কাজেই রাধিকা হলেন স্বরূপ শক্তি হ্লাদিনীর অধিষ্ঠাত্রীদেবী।

প্রশ্ন : ১৮৯১ ॥ ভগবানকে সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ বলা হয়। এই দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : সৎ, চিৎ এবং আনন্দ এই তিনটি শব্দ দ্বারা সচ্চিদানন্দ শব্দটির গঠন। সৎ-শব্দে সত্তা বুঝায়। চিৎ শব্দে চৈতন্য বা জড়াতীত বস্তু বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ এই যে তিনি সৎ, চিৎ ও আনন্দের দ্বারা পূর্ণ। অর্থাৎ তিনি পরিপূর্ণ সত্তা, পরিপূর্ণ চৈতন্য এবং পরিপূর্ণ আনন্দ। সমস্ত সত্তার, সমস্ত চৈতন্যের এবং আনন্দের নিদান হলেন শ্রীকৃষ্ণ।

প্রশ্ন : ১৮৯২ ॥ জীবের মধ্যে কি ভগবানের স্বরূপ শক্তি আছে?

উত্তর : শ্রীমদ্ ভাগবতের ১/১১/৩৯ শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামীপাদ লিখেছেন : "জীবের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি নাই।" শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাঁর পরমাত্মসন্দর্ভ গ্রন্থে বলেন, জীবশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশই জীব, স্বরূপ শক্তিযুক্ত শুদ্ধ কৃষ্ণের অংশ নয়। যদি জীবে স্বরূপ শক্তি থাকতো তবে জীব স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণেরই অংশ হতো। সমস্ত ভগবৎস্বরূপই স্বরূপশক্তি বিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ। এজন্য তাঁদেরকে স্বাংশ বলা হয়। জীব ভগবানের স্বাংশ নয়, বরং বিভিন্নাংশ। স্বরূপ শক্তি থাকলে জীব ভগবানের স্বাংশ হতো। জীবশক্তি অপর দুই শক্তি স্বরূপ শক্তি এবং মায়াশক্তির অংশ নয়—বরং একটি পৃথক শক্তি। এজন্য জীবকে তটস্থা শক্তি—অর্থাৎ স্বরূপ শক্তি এবং মায়াশক্তির মধ্যস্থ শক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৮৯৩ ॥ শ্রীরাধাকে কৃষ্ণময়ী বলা হয় কেন?

উত্তর : শ্রীরাধার ভিতরেও কৃষ্ণ, বাইরেও কৃষ্ণ। ভিতরে কৃষ্ণ বলার তাৎপর্য হল তিনি যখন চক্ষু মুদিয়া থাকেন তখন হৃদয়ে তাঁর চিত্ত চোর কৃষ্ণকেই দেখেন, কৃষ্ণের সঙ্গ-সুখই অনুভব করেন। আবার বাইরে কৃষ্ণ বলার তাৎপর্য হল এই যে চক্ষু মেলিয়া বাইরে শ্রীরাধা যাই দেখেন তার মধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি উদ্দীপিত হয়। যেমন তমাল গাছের বা নবমেঘের প্রতি দৃষ্টি পড়লে শ্রীকৃষ্ণের বর্ণের কথা স্মরণ হয়। এই অর্থেই শ্রীরাধা কৃষ্ণময়ী।

প্রশ্ন : ১৮৯৪ ॥ গোপীদের প্রেম যদি কাম নাই হয় তবে তাঁদের শ্রীকৃষ্ণ বিষয়ক ভাবকে শ্রীমদ্ ভাগবতের ৭/১/৩০ নং শ্লোকে কাম শব্দে অভিহিত করা হয়েছে কেন?

উত্তর : গোপীদের প্রেম কাম শব্দে অভিহিত হলেও বাস্তবিক পক্ষে আত্মেন্দ্রিয় কাম ছিল না। অর্থাৎ নিজেদের ইন্দ্রিয় সুখ ভোগের কাম ছিল না। তা ছিল কৃষ্ণের ইন্দ্রিয় তোষণের জন্য। যদি কামই হতো তাহলে উদ্ধবের মতো ভগবানের প্রিয় নিষ্কাম ভক্ত কখনো গোপী প্রেম পাওয়ার জন্য প্রার্থনা করতেন না।

প্রশ্ন : ১৮৯৫ ॥ গোপীপ্রেম যদি কামই না হয় তবে শ্রীমদ্ ভাগবতে তাকে কাম বলার হেতু কি?

উত্তর : গোপীর প্রেম জড়জগতের কাম নয়—অর্থাৎ প্রাকৃত কাম নয়। কামক্রীড়ার সাম্যে তাকে কাম নাম বলা হয়েছে। কাম-ক্রীড়ার সাথে প্রেম-ক্রীড়ার অনেকটা বাহ্যিক মিল আছে বলেই গোপী প্রেমকে কাম বলা হয়। কিন্তু বাহ্যিক সাদৃশ্য বা মিল থাকলেও কাম-ক্রীড়ার এবং গোপীগণের প্রেম-ক্রীড়ার উদ্দেশ্য এক নয়—প্রেম স্বরূপত কাম নয়। এইজন্য শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে—

আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে প্রেম নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল।
কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য—হয় প্রেম ত প্রবল ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/১৪১-১৪২)

প্রশ্ন : ১৮৯৬ ॥ লোকধর্ম বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : সহজ কথায় লোকাচার বুঝায়। লোক সমাজে থাকতে হলে পরস্পরের বন্ধুত্ব, সৌজন্য ও মর্যাদা রক্ষার জন্য যে সমস্ত আচার পালন করতে হয় তাই লোকধর্ম। যেমন একজনের বিপদে অন্যজন সহায়তা করলে অন্যজনের বিপদেও প্রথম জনের সহায়তা করা উচিত। সমস্ত লোকাচার সম্পর্কেও একই ধরনের আচরণ পালনীয়। উল্লেখ্য যে লোকধর্ম-পালন মানুষের ইন্দ্রিয় তৃপ্তির অর্ন্তগত—তাই এখানে কামের বিষয়-বাসনার গন্ধ আছে।

প্রশ্ন : ১৮৯৭ ॥ বেদধর্ম বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : সংক্ষেপে বলা হল : বেদবিহিত বিভিন্ন কর্ম। যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদিকে বেদধর্ম বলা যায়। এইসব কর্ম করলে পরকালে স্বর্গাদি সুখ-ভোগ এবং ইহকালে ধন-সম্পদ লাভের সম্ভাবনা আছে। তার এরূপ কর্মও নিজের ইন্দ্রিয় তোষণের মধ্যেই পড়ে। কারণ এখানে কামনা-বাসনা আছে।

প্রশ্ন : ১৮৯৮ ॥ কৃষ্ণে অনুরাগ—এই কথার অর্থ কি?

উত্তর : রাগের (প্রীতির) উৎকর্ষ অবস্থার নাম অনুরাগ। প্রনয়ের উৎকর্ষতাবশতঃ যাতে কৃষ্ণ লাভের সম্ভাবনা থাকে তাকে কৃষ্ণে অনুরাগ বলা হয়। অনুরাগই প্রেমের স্বরূপ লক্ষণ। অনুরাগ হল কৃষ্ণের স্বরূপ শক্তির বৃত্তি।

প্রশ্ন : ১৮৯৯ ॥ শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা থেকে দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন, যে তাঁকে যেভাবে ভজনা করেন, তাকে তিঁনি সেইভাবেই ফলদান করেন। কিন্তু এই প্রতিজ্ঞাতো তিনি গোপীদের বেলায় রক্ষা করতে পারেন নাই। কারণ কি?

উত্তর : ভগবান গোপীদেরকে তাঁদের ভজনের কোন প্রতিদান দিতে পারেন নাই—একথা সত্য। কারণ গোপীদের নিজেদের কোন বাসনা ছিল না। কাজেই বাসনা রূপ ফলদানের কোন সুযোগ বা সম্ভাবনাই ছিল না। এই কারণে শ্রীকৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করেছেন যে গোপীদের সেবার প্রতিদান দিতে তিনি অসমর্থ। এজন্যই তিনি গোপী-ঋণে আবদ্ধ।

প্রশ্ন : ১৯০০ ॥ কৃষ্ণপ্রেমে গোপীদের নাকি দেহজ কাম ছিল না। তাহলে তাঁরা নিজেদের নানারকমে সজ্জিত করতেন কেন?

উত্তর : নিজের সুখের জন্য, নিজের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তির জন্য গোপীরা সুন্দর বেশভূষা এবং দেহ সজ্জিত করতেন না। শুধুমাত্র কৃষ্ণের সুখের এবং প্রীতির জন্য তা করতেন মাত্র।

এ দেহ-দর্শন-স্পর্শে কৃষ্ণসন্তোষণ।
এই লাগি করে দেহের মার্জ্জনভূষণ ॥

(চৈ. চ. আদি ৪/১৫৫)

প্রশ্ন : ১৯০১ ॥ শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করে যে সুখ জন্মে সেই সুখের লোভেইতো গোপীরা কৃষ্ণ সেবায় প্রবৃত্ত হতে পারেন। তাই যদি হয় তবেতো গোপীভাবে নিজের সুখের বাসনামূলক কামদোষই থেকে যায়।

উত্তর : গোপীদের রূপ-গুণ আস্বাদন করেই শ্রীকৃষ্ণের সুখ। কৃষ্ণের এই সুখ দেখে কৃষ্ণসেবার স্বরূপগত ধর্মবশতঃ গোপীদের চিত্তে যে সুখ জন্মে সেই সুখও শ্রীকৃষ্ণের সুখকেই বাড়ায়। কারণ সুখে গোপীদের প্রফুল্লতা ও শোভা বাড়ে। আর তা দর্শন করে শ্রীকৃষ্ণ আরও সুখী হন। কাজেই গোপীদের সুখ কৃষ্ণের সুখ বাড়ানোর জন্যই, নিজেদের সুখ ও কামনা-বাসনার জন্য নয়। তাই গোপীভাবে কাম-দোষ থাকতে পারে না।

প্রশ্ন : ১৯০২ ॥ গোপীগণতো ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী বা কান্তা। তবে শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে কেন বলা হল গোপীরা হলেন প্রিয়া, শিষ্যা, সখী, দাসী ইত্যাদি?

উত্তর : গোপীদের প্রেম ছিল একমাত্র কৃষ্ণ-সুখের জন্য। যেকোন উপায়েই হউক না কেন, কৃষ্ণের প্রীতিবিধান করাই তাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। তাই তাঁরা কৃষ্ণের সব হতে পারেন : সহায় বলুন, গুরু বলুন, বান্ধব বলুন, প্রেয়সী বলুন, সখী বলুন, দাসী বলুন ইত্যাদি। লোকধর্ম, বেদ ধর্ম, স্বজন, মান, অপমান, সম্পর্ক কোন কিছুরই অপেক্ষা নাই বলেই গোপীরা যে কোনভাবেই কৃষ্ণের সেবা করতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৯০৩ ॥ শ্রীরাধারানীকে রাসেশ্বরী বলা হয়। কেন?

উত্তর : শতকোটী গোপী উপস্থিত থাকলেও যদি শ্রীরাধারানী উপস্থিত না থাকেন তাহলে রাসলীলা সুসম্পন্ন হতে পারে না। শ্রীরাধাই হলেন রাসলীলার পরম আশ্রয়। শ্রীরাধা না থাকলে রাসলীলার বাসনাও কৃষ্ণের হৃদয়ে থাকে না। আর শ্রীরাধা থাকলে রাসলীলা তাঁকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত হয়। এই কারণে রাধারানীকে রাসেশ্বরী বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৯০৪ ॥ শাস্ত্রে দেখি বসন্ত রাসের সময় এক পর্যায়ে শ্রীরাধারানী রাস ছেড়ে চলে গেলেন। কেন?

উত্তর : রাসকালীন শ্রীকৃষ্ণ অন্যান্য গোপীদের সাথে যেরূপ ব্যবহার করছেন, শ্রীরাধার সাথেও একইরূপ ব্যবহারই করছেন—তাঁর সাথে কোন বিশেষ বা তাৎপর্য্যপূর্ণ ব্যবহার করছেন না—এই দেখেই শ্রীরাধার মধ্যে বাম্যভাব উপস্থিত হয়। তখন তিনি রাসমণ্ডলী ছেড়ে অন্তর্হিত হন।

প্রশ্ন : ১৯০৫ ॥ যুগধর্ম নাম ও প্রেম প্রচারের জন্যই কি শ্রীমন্ মহাপ্রভু অবতীর্ণ হন?

উত্তর : শৃঙ্গার রস দুইভাবে আস্বাদন করতে হয় : বিষয়রূপে এবং আশ্রয়রূপে। ব্রজলীলায় শ্রীকৃষ্ণ বিষয়রূপেই শৃঙ্গার রস আস্বাদন করেন। আশ্রয়রূপে আস্বাদন করতে পারেন নাই। কারণ ব্রজে তিনি শৃঙ্গার রসের বিষয়ই ছিলেন, আশ্রয় ছিলেন শ্রীরাধা ও তাঁর সখীগণ। ব্রজে আশ্রয় জাতীয় শৃঙ্গার রসের আস্বাদন কৃষ্ণের বাকী ছিল। এই আস্বাদনের জন্যই শ্রীরাধার ভাব-অঙ্গীকার করে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হন। এই হল তার অবতরণের প্রধান কারণ। এই আশ্রয়জাতীয় শৃঙ্গার রস আস্বাদন করতে করতে আনুষঙ্গিকভাবে তিনি নাম ও প্রেম প্রচার করেছিলেন। কাজেই নাম ও প্রেমপ্রচার হল তার অবতরনের গৌন কারণ।

প্রশ্ন : ১৯০৬ ॥ শ্রীকৃষ্ণ নিজেইতো আত্মারাম, আপ্তকাম এবং স্বরাট। তাঁর আনন্দের জন্য আবার শ্রীরাধার প্রয়োজন হল কেন?

উত্তর : শ্রীকৃষ্ণ আত্মারাম, আপ্তকাম এবং স্বরাট হওয়ায় একমাত্র তাঁর স্বরূপ শক্তি ব্যতীত অন্য কোন বস্তুই তাকে আনন্দ দানে সমর্থ

নয়। শ্রীরাধা তাঁর স্বরূপশক্তির মূর্তবিগ্রহ এবং স্বরূপশক্তির অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এই কারণে শ্রীরাধা কৃষ্ণকে সর্বপ্রকারে আনন্দ প্রদানে সমর্থা।

প্রশ্ন : ১৯০৭ ॥ শ্রীবলরামের আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। কেন?

উত্তর : প্রকটকালীন লীলায় এক গর্ভ থেকে অন্য গর্ভে আকৃষ্ট হয়েছিলেন বলে শ্রীবলরামের আর এক নাম সঙ্কর্ষণ। প্রথমে কংস কারাগারে শ্রীদেবকীর গর্ভেই শ্রীবলরামের আবির্ভাব হয়। কংসের অত্যাচারের আশঙ্কায় ভগবানের নির্দেশে যোগমায়া তাঁকে দেবকীর গর্ভ থেকে আকর্ষণ করে বসুদেবের অপর স্ত্রী রোহিনীদেবীর গর্ভে স্থাপন করেন। শ্রীরোহিনী দেবী তখন গোকুলে নন্দালয়ে ছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯০৮ ॥ ভগবানের প্রকট ও অপ্রকট লীলার ধাম কি একই না দুই রকম?

উত্তর : শ্রীল শ্রীজীবগোস্বামী তাঁর শ্রীকৃষ্ণ সন্দর্ভঃ (১০৬) গ্রন্থে বলেন : শ্রীভগবানের নিত্য অধিষ্ঠানহেতু প্রকটে এবং অপ্রকটে এই উভয় স্থানে প্রকাশমান ধামকে একই ধাম বলে মনে করতে হবে। উভয়স্থলে প্রকাশমান ধামের নামও এক, গুণও এক এবং রূপও এক। তাই একই ধাম উভয়স্থানে—তাই মনে করতে হয়। তানা হলে ধামের অস্তিত্ব স্বীকার করতে হয় যা কল্পনাতীত।

প্রশ্ন : ১৯০৯ ॥ দেবকীনন্দন বাসুদেব এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের মধ্যে পার্থক্য কি?

উত্তর : বাসুদেব কৃষ্ণ হলেন দেবকী এবং বসুদেবের পুত্র। তিঁনি দ্বারকার চতুর্ব্যুহের প্রথম ব্যুহ এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ বিগ্রহ। ব্রজেন্দ্রনন্দন দ্বিভূজ বিশিষ্ট (দুই হাত বিশিষ্ট); তাঁর গোপবেশ এবং গোপ-অভিমান আছে। বাসুদেব কখনও দ্বিভূজ, কখনো চতুর্ভূজ হন। তাঁর ক্ষত্রিয় বেশ এবং ক্ষত্রিয়-অভিমান আছে।

প্রশ্ন : ১৯১০ ॥ শ্রীনারায়ণের শ্রীশক্তি, ভূ-শক্তি এবং লীলাশক্তি বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : সৌন্দর্য্য ও সম্পত্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম হল শ্রীশক্তি। তিনি নারায়ণের প্রেয়সী লক্ষ্মীরূপে বিভিন্ন উপকরণ দ্বারা নারায়ণের

চরণ-সেবা করেন। তিনি চতুর্ভূজা স্বর্ণ প্রতিমার ন্যায়, নবযৌবনা এবং শ্রীনারায়ণের বামপাশে অবস্থান করেন। জগতের উৎপত্তি স্থিতির অধিষ্ঠাত্রী শক্তির নাম হল ভূ-শক্তি। শ্রীনারায়ণের লীলাবিধায়িনী শক্তিকেই লীলা শক্তি বলা হয়। মূর্ত্ত বিগ্রহরূপে ভূশক্তি এবং লীলাশক্তি লক্ষ্মীদেবীর উভয় পাশে অবস্থান করেন।

প্রশ্ন : ১৯১১ ॥ ব্রজলীলায় কৃষ্ণ অনেক অসুর বধ করেছেন। এই কৃষ্ণ কি ব্রজেন্দ্রনন্দন না বাসুদেব কৃষ্ণ?

উত্তর : বস্তুতঃ স্বয়ং ভগবান ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ নিজে অসুর বধ করেন না। তিনি যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হন তখন স্থিত কর্ত্তা বিষ্ণু ও শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহের মধ্যে থেকে অবতীর্ণ হন। অসুর সংহার এই বিষ্ণুই করেন। কাজেই বাসুদেব কৃষ্ণই অসুর নিহত করেন, দ্বিভূজ মুরলীধর কৃষ্ণ নন।

প্রশ্ন : ১৯১২ ॥ শ্রীমদ্ ভাগবতে মহত্তত্ব শব্দটি সৃষ্টির সাথে জড়িত দেখতে পাওয়া যায়। এর দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : সৃষ্টির প্রারম্ভে মহাবিষ্ণু প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি রেখে তাতে শক্তি প্রয়োগ করেন। সেই শক্তির প্রভাবে প্রকৃতির সাম্য অবস্থা নষ্ট হয় এবং প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হয়। এভাবে প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হলে তার সর্বপ্রথম বিকার বা পরিণতিকে বলা হয় মহৎ বা মহত্তত্ব।

প্রশ্ন : ১৯১৩ ॥ কৃষ্ণকে অবতার না বলে অবতারী বলা হয় কেন?

উত্তর : অবতারী শব্দের অর্থ হল অবতার কর্ত্তা। অর্থাৎ সমস্ত অবতারের মূল। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ থেকেই সব অবতার সৃষ্টি হয়। এজন্য তাকে অবতারী বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৯১৪ ॥ কৃষ্ণই সমস্ত অবতারের অবতারী। আবার শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতের এক জায়গায় পাই মহাবিষ্ণুও অবতারী। এ কেমন কথা?

উত্তর : উভয় কথাই সঠিক। কৃষ্ণ থেকেই মহাবিষ্ণুর উৎপত্তি। মহাবিষ্ণু থেকেই আবার মৎস, কূর্ম ইত্যাদি অবতার এসেছেন। কাজেই

কৃষ্ণ হলেন মূল অবতারী। আর মহাবিষ্ণু হলেন অবতার সমূহের অবতারী। মহাবিষ্ণু হলেন মূল অবতার। তার থেকেই অপরাপর অবতার এসেছে।

প্রশ্ন : ১৯১৫ ॥ এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন কত?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে বলা হয়েছে আমাদের ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন পঞ্চাশ কোটি যোজন। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ সমান। আবার অন্যত্র বলা হয়েছে এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশ কোটি যোজন। কোন ব্রহ্মাণ্ড সাতকোটি, কোনটি লক্ষকোটি, কোনটি নিযুত (দশ হাজার) কোটি যোজন বিশিষ্ট। ব্রহ্মাণ্ড গোলাকার বলেই মনে হয় দৈর্ঘ্য প্রস্থ সমান বলা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৯১৬ ॥ ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধাম কোথায়?

উত্তর : গর্ভোদশায়ী বিষ্ণুর নাভি থেকে উৎপন্ন পদ্মের নালে যে চৌদ্দভুবণ আছে তার মধ্যে একটি ভুবনের নাম ভূর্লোক বা ধরণী। এতে সাতটী সমুদ্র আছে। এর মধ্যে একটির নাম হল ক্ষীর সমুদ্র। এই সমুদ্রের মধ্যে শ্বেতদ্বীপ নামে একটি দ্বীপ আছে। এই শ্বেতদ্বীপই ব্রহ্মাণ্ডের পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর ধাম। আসলে তাঁর নিত্যধাম হল পরব্যোমে (বৈকুণ্ঠে)। শ্বেতদ্বীপে তাই প্রকটিত হয়।

প্রশ্ন : ১৯১৭ ॥ অনন্তদেবের পরিচয় জানতে চাই।

উত্তর : অনন্তদেব হলেন ভগবানের অংশ এবং ভক্ত অবতার। ভগবানের শর্য্যারূপে অনন্তদেব সর্পাকৃতির। কিন্তু স্বরূপে তিনি সর্পাকার নন। শ্রীমদ ভাগবতের পঞ্চম স্কন্দের ২৫তম অধ্যায় থেকে জানা যায় তাঁর দুই চরণ, এক মস্তক এবং বলয় শোভিত অনেক হাত আছে। এই সমস্ত হাতে নাগকন্যাগণ অনুরাগের সাথে অগুরু, চন্দন ও কুঙ্কুম লেপন করেন। তাঁর দেহ রূপার ন্যায় সাদা। আবার অন্যত্র তাঁর সহস্র মুখ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সকল মুখেও তিনি শ্রীকৃষ্ণের গুণগান করে আজ পর্যন্ত শেষ করতে পারেন নাই।

প্রশ্ন : ১৯১৮ ॥ শ্রী অনন্তদেব ভগবান শ্রীকৃষ্ণের সেবা কি কি উপায়ে করেন?

উত্তর : শ্রীচৈতন্য চরিতামৃতে (আদি ৫/১০৬) বলা হয়েছে যে অনন্তদেব ছত্র (ছাতা), পাদুকা (জুতা), শর্য্যা, উপাধান (বালিশ), বসন

(কাপড়), আরাম (উপবন বা বাগান), আবাস (গৃহাদি), যজ্ঞসূত্র (উপবীত), সিংহাসন (বসবার স্থান) ইত্যাদি রূপে ভগবানের সেবা করেন।

প্রশ্ন : ১৯১৯ ॥ রুদ্র-শিব কে? তাঁর কাজ কি?

উত্তর : সদাশিরের যে অংশ তমোগুণকে অঙ্গীকার করে গুণ-অবতার রূপে জগতে অবতীর্ণ হন তাকে রুদ্র বা শিব বলে। রুদ্র বা শিব হলেন জগতের সংহার কর্ত্তা।

প্রশ্ন : ১৯২০ ॥ শ্রী অদ্বৈত প্রভু মহাবিষ্ণুর অবতার। তাহলে তিনি কি করে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দাসের-অনুদাস হলেন?

উত্তর : শ্রীচৈতন্যের দাস হলেন শ্রীনিত্যানন্দ। তাঁর অংশ হলেন (সুতরাং সেবক) শ্রী সঙ্কর্ষণ। আর সঙ্কর্ষণের অংশ (কাজেই সেবক) হলেন শ্রীমহাবিষ্ণু। এই মহাবিষ্ণুর অবতার হলেন শ্রী অদ্বৈত। কাজেই তিনি শ্রীকৃষ্ণের বা শ্রীচৈতন্যের দাসের-অনুদাসই হলেন।

প্রশ্ন : ১৯২১ ॥ শ্রী অদ্বৈত প্রভুকে ভক্ত-অবতার বলা হয় কেন?

উত্তর : স্বরূপে তিনি অবতার কিন্তু আচরণের দিক থেকে ভক্ত। এজন্য তাঁকে ভক্ত-অবতার বা ভক্তরূপে অবতার বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৯২২ ॥ ভগবৎ তত্ত্বে অংশী, অংশ, কলা ইত্যাদি শব্দের ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায়। আসলে এসব দ্বারা কি বুঝানো হয়?

উত্তর : অংশী হলেন স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। আর শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অবতারকে তার অংশ বলা হয়। যেমন মহাবিষ্ণু। আবার অংশের অংশকে কলা বলা হয়। যেমন শ্রীকৃষ্ণ থেকে শ্রীবলদেব, তাঁর থেকে সঙ্কর্ষণদেব, সঙ্কর্ষণদেব থেকে সদাশিব আসেন। এখানে অংশ হলেন বলদেব, কলা হলেন সঙ্কর্ষণদেব এবং সদাশিব।

প্রশ্ন : ১৯২৩ ॥ পিতা-মাতা হওয়া সত্ত্বেও শ্রীকৃষ্ণের কাছে নন্দ-যশোদা যত প্রিয়, দেবকী-বসুদেব তত প্রিয় নহেন কেন?

উত্তর : বসুদেব-দেবকী ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে কৃষ্ণকে দেখতেন এবং সেভাবে আচরণ করতেন। নন্দ-যশোদা বাৎসল্য রূপে ভগবানকে দেখতেন। প্রকটকালীন সময় বসুদেব-দেবকীর কাছে যখন ছিলেন

তখন নন্দ-যশোদার বিরহ বেদনা কৃষ্ণকে পীড়িত করতো। কিন্তু ব্রজে নন্দ-যশোদার কাছে অবস্থানকালে বসুদেব-দেবকীর বিরহে তিনি পীড়িত হতেন না। এর কারণ এই যে বসুদেব-দেবকী অপেক্ষা নন্দ-যশোদার প্রেমের বিকাশ অনেক বেশী। তাই তাঁরা দেবকী-বসুদেব অপেক্ষা প্রিয়তা অংশে বড় ছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯২৪ ॥ বৈষ্ণব শাস্ত্র অনুযায়ী ছয়তত্ত্ব কি?

উত্তর : গুরু, ভক্ত, ঈশ, অবতার, প্রকাশ এবং শক্তি—এদেরকে ছয়তত্ত্ব বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৯২৫ ॥ পঞ্চতত্ত্ব বলতে কি পাঁচটি পৃথক তত্ত্ব বুঝায়?

উত্তর : না। একই তত্ত্বের পাঁচরূপে প্রকাশ পাওয়ায় একে পঞ্চতত্ত্ব বলা হয়। অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু নিজে ভক্ত ভাবে, নিত্যানন্দ প্রভু ভক্তস্বরূপ, অদ্বৈতপ্রভু ভক্ত-অবতার, গদাধর প্রভু ভক্তশক্তি এবং শ্রীবাস প্রভু শুদ্ধ ভক্ত—এই পাঁচরূপে নিজেকেই প্রকাশ করেন। এজন্য তাঁকেই একত্রে পঞ্চতত্ত্ব বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৯২৬ ॥ শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু স্বয়ং ভগবান হওয়ায়তো একতত্ত্ব। তাহলে কেন তিনি পঞ্চতত্ত্বরূপে নিজেকে প্রকাশ করলেন?

উত্তর : রসের বৈচিত্র-সম্পাদনের জন্য বিভিন্ন ভাব ও আবেশের প্রয়োজন হয়। এজন্যই একই তত্ত্ববস্তু ভিন্ন ভিন্ন ভাব ও আবেশে পাঁচভাগে বিভক্ত হয়ে আত্মপ্রকট করেছেন।

প্রশ্ন : ১৯২৭ ॥ শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান। তাঁর আবার কিসের অভাব যে তাঁকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করে শ্রীচৈতন্যরূপে আবির্ভূত হতে হল?

উত্তর : কোন অভাবের বশবর্তী হয়ে তিনি ভক্তভাব অঙ্গীকার করেন নাই। নিজের মাধুর্য্যের এক অপূর্ব ধর্মবশতঃই তাঁকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করতে হয়েছে। কৃষ্ণ মাধুর্য্যের এমনই এক অদ্ভুত ধর্ম যে এর আস্বাদনের জন্য সকলেই চঞ্চল হয়ে পড়েন। কিন্তু ভক্তভাব ছাড়া এর আস্বাদন সম্ভব হয় না বলেই শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তভাব অঙ্গীকার করতে হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৯২৮ ॥ শ্রীগদাধর এবং শ্রীবাস প্রভুকে ঈশ্বরতত্ত্ব না বলে ভক্ততত্ত্ব বলা হয় কেন?

উত্তর : ভক্তাখ্য এবং ভক্ত-শক্তি—এই দুই তত্ত্বও শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাব বিশেষ। স্বরূপতঃ ঈশ্বরতত্ত্ব হলেও এদের মধ্যে ঈশ্বরত্ব অত্যন্ত প্রচ্ছন্ন অবস্থায় আছে। তাঁদের মধ্যে ভক্তভাবই প্রধানরূপে প্রকটিত। এজন্য এঁদেরকে কেবল ভক্ততত্ত্বের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

প্রশ্ন : ১৯২৯ ॥ মায়াবাদী কাদেরকে বলা হয়?

উত্তর : শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের মতের অনুসারী জ্ঞান মার্গের লোকজনদেরকে মায়াবাদী বলা হয়। তাঁরা জীব ও ঈশ্বরের সেব্য-সেবকত্ব স্বীকার করেন না। ফলে ভগবৎ ভক্তি ও প্রেম থেকে বঞ্চিত থাকেন।

প্রশ্ন : ১৯৩০ ॥ জীবকে প্রেমদান করার জন্যই যদি মহাপ্রভু আবির্ভূত হন তবে যারা তাঁর নিন্দা করেছিল তাদের অপরাধ তিনি গ্রহণ করেছিলেন কেন? তাদের অপরাধ ক্ষমা না করে গৃহস্থাশ্রমে থাকতেই প্রেম দিলেন না কেন?

উত্তর : অপরাধীকে প্রেম দেবেন কিভাবে। অপরাধীদের চিত্ত কলুষিত ছিল বলেই তিনি প্রেম দান করেন নাই। পরে যখন এসব লোকের অনুতাপ জন্মে এবং তাদের মন প্রেমভক্তি লাভের যোগ্যতা লাভ করে, তখন কিন্তু মহাপ্রভু তাদেরকে প্রেম দান করেছিলেন।

প্রশ্ন : ১৯৩১ ॥ সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের দর্শন নিষিদ্ধ থাকা সত্ত্বেও কিভাবে মহাপ্রভু কাশীতে থাকার সময় চন্দ্রশেখর বৈদ্যের গৃহে অবস্থান করেছিলেন?

উত্তর : সন্ন্যাসীর পক্ষে শূদ্রের দর্শন নিষিদ্ধ—এই হল সন্ন্যাসীদের পক্ষে একটি সম্প্রদায়গত এবং সামাজিক বিধি। প্রভু নিজে স্বতন্ত্র ঈশ্বর। তিনি কোন বিধিনিষেধের অধীন নন। তিনি নিজের ইচ্ছায় চলেন। তাঁর ইচ্ছা হয়েছে—তাই তিনি লৌকিক লীলায় সন্ন্যাসী হয়েও

শূদ্র চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করেছিলেন। তাছাড়া আত্মধর্মের তুলানায় সম্প্রদায়গত বিধি যে নিতান্তই তুচ্ছ, প্রভুর এই আচরণে তাও দেখা গেল। তাছাড়া ভক্তাধীন—এইও একটি কারণ ছিল।

প্রশ্ন : ১৯৩২ ॥ নাম সঙ্কীর্তন ছাড়াও ভক্তি-অঙ্গের অন্য কোন অনুষ্ঠানেও যখন অভীষ্ট-পাওয়া যাইতে পারে বলে শাস্ত্রে দেখতে পাওয়া যায় এবং "এক অঙ্গ-সাধে" ইত্যাদি বলে শ্রীমন্ মহাপ্রভু যখন তা স্বীকার করেছেন, তখন বৃহৎ নারদীয় পুরানের নাস্তেব নাস্তেব গতিরন্যথা—বাক্যের সার্থকতা কোথায়?

উত্তর : বৃহৎ নারদীয় পুরাণের **"হরের্ণাম"** শ্লোকের অনুমোদন করে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীহরি নামের সর্বশ্রেষ্ঠতার সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বব্যাপকতাই স্বীকার ও প্রচার করেছেন। এভাবে সর্ব্বব্যাপকতা স্বীকার করে সাধন-ভক্তি প্রসঙ্গে নামকীর্তন ছাড়াও অন্যান্য অঙ্গের উল্লেখ করায়—বিশেষত অন্য অঙ্গের সাধনেও অভীষ্ট পাওয়ার অনুমোদন করায় মনে হয় যে শ্রীহরিনামের আশ্রয় গ্রহণপূর্বক অন্যান্য সাধন-অঙ্গের—অর্থাৎ সমস্তের বা একের অনুষ্ঠানেই অভীষ্ট পাওয়া যেতে পারে। কিন্তু নামের আশ্রয় ব্যতীত অন্য অঙ্গের অনুষ্ঠানে কোন ফল হবে না।

প্রশ্ন : ১৯৩৩ ॥ ত্রিবর্গ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : ধর্ম, অর্থ এবং কাম—এই তিনটিকে ত্রিবর্গ বলে। সাধারণ লোকের মধ্যে যারা ভোগী, তারা সাধারণত ত্রিবর্গ নিয়েই ব্যস্ত থাকেন। মোক্ষ বা মুক্তির কথা তারা ভাবেন না। ত্রিবর্গ থেকে যে সুখ পাওয়া যায় তা হল জড় সুখ।

প্রশ্ন : ১৯৩৪ ॥ জীবের হৃদয়ে কৃষ্ণ প্রেম উদয় হলে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়?

উত্তর : নিচের লক্ষণসমূহ প্রকাশ পায় :

১. গায় : কৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলা সম্পর্কে গান গায়।

২. ইতি উতি ধায় : এদিকে ওদিকে ধাওয়া করে।

৩. **স্বাত্ত্বিকভাব :** স্বেদ (ঘাম), কম্প, রোমাঞ্চ, অশ্রু, স্বরভেদ, বিবর্ণ ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়।

৪. উন্মাদ, বিষাদ, ধৈয্য, গর্ব্ব, হর্ষ এবং দৈন্যতা প্রকাশ পায়।

প্রশ্ন : ১৯৩৫ ॥ ব্রহ্মানন্দ এবং নাম সংকীর্তনের আনন্দের মধ্যে তফাৎ কি?

উত্তর : নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভবজনিত আনন্দকে ব্রহ্মানন্দ বলা হয়। নাম সংকীর্তনে যে আনন্দ পাওয়া যায় তাকে মহাসমুদ্র মনে করলে ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দকে নরম মাটিতে গরুর পায়ের চাপে যে ক্ষুদ্র গর্ত হয় তাতে যে পরিমাণ জল থাকতে পারে সেই জলের তুল্য মনে করা যায়। তাছাড়া ব্রহ্মানন্দে বৈচিত্র নাই, নাম সংকীর্তনের আনন্দে বৈচিত্র আছে।

প্রশ্ন : ১৯৩৬ ॥ উপনিষদ কি? উপনিষদ কতটি আছে?

উত্তর : বেদের জ্ঞানকাণ্ডমূলক গ্রন্থসমূহকে উপনিষদ বলে। ঈশ, কঠ, কেন, বৃহদারন্যক ইত্যাদি নামে অনেক উপনিষদ আছে। এ পর্যন্ত ১০৮ খানা উপনিষদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

প্রশ্ন : ১৯৩৭ ॥ বেদান্ত সূত্র কি? কে এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন?

উত্তর : সারার্থ বিশিষ্ট অল্প-অক্ষর বিশিষ্ট বাক্যকে সূত্র বলে। কিন্তু এই ক্ষুদ্র বাক্যের মধ্যে গভীর অর্থ নিহিত থাকে। ব্যাসদেব বেদান্ত সূত্র নামক একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এতে ৫৫৫টি সূত্র আছে। একে ব্রহ্মসূত্র বা শারীরক সূত্রও বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৯৩৮ ॥ শ্রুতি বা উপনিষদে নিরাকার ব্রহ্মের যে কথা বলা হয়েছে তা কি অলীক?

উত্তর : না তা অলীক নয়, তাও সত্য। সাকার ব্রহ্ম যেমন সত্য, নিরাকার ব্রহ্মও তেমনি সত্য এবং নিত্য। কারণ ব্রহ্মের শক্তি আছে বলে তাঁতে অনন্ত বৈচিত্র নিত্য বর্তমান। যে বৈচিত্রীতে শক্তির ন্যূনতম বিকাশ সেই বৈচিত্রীই নিরাকার। কাজেই এই নিরাকার বৈচিত্রীও সত্য।

প্রশ্ন : ১৯৩৯ ॥ সাকার বস্তু মাত্রই পরিচ্ছিন্ন—অর্থাৎ সীমাবদ্ধ, ব্রহ্ম যদি সাকার হন তবে কিরূপে বিষ্ণু হতে পারেন?

উত্তর : বিভু ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম থাকায় যে কোন স্বরুপেই তিনি বিভু—অর্থাৎ সর্বব্যাপক হতে পারেন। কাজেই স্যাকার ব্রহ্ম বিষ্ণুও হতে পারেন।

প্রশ্ন : ১৯৪০ ॥ ব্রহ্মকে নিরাকার বলায় শ্রীমৎ শঙ্কারাচার্য্যের কোন দোষ হয় নাই?

উত্তর : ব্রহ্ম বস্তুর নিরাকার অর্থ করার এবং সাকায় স্বরূপকে প্রাকৃত সত্ত্বগুণের বিকার বলায় শঙ্করাচার্য্যের কোন বিশেষ দোষ হয় নাই। কারণ বিশেষ অবস্থায় ভগবানের আদেশেই তিনি এরূপ অর্থ করেছেন।

প্রশ্ন : ১৯৪১ ॥ শ্রী শঙ্করাচার্য্যের পরিণামবাদ বলতে কি বুঝায়?

উত্তর : এই জগত হল ব্রহ্মের পরিণতি। ঘট যেমন মাটির পরিণতি, সেইরূপ জগতও ব্রহ্মের পরিণতি। এরূপ মতকেই পরিণামবাদ বলা হয়।

প্রশ্ন : ১৯৪২ ॥ চিন্তামণি কি?

উত্তর : এক ধরনের বিশেষ মণি। এথেকে বিভিন্ন ধরনের রত্নের উদ্ভব হয়। তা সত্ত্বেও এর কোনরূপ ক্ষয় বা বিকৃতি হয় না। পূর্বে যেমন থাকে রত্ন প্রসবের পরও তেমনই থাকে।

প্রশ্ন : ১৯৪৩ ॥ প্রণব কি? প্রণবই কি ব্রহ্ম?

উত্তর : ওঙ্কারকে প্রণব বলে। প্রশ্নোপনিষদে বলা হয়েছে, হে সত্যকাম্ এই ওঙ্কারই পরব্রহ্ম এবং অপর ব্রহ্ম। তৈত্তিরীয় উপনিষদ বলেন—ওম্ ইতি ব্রহ্ম। এই পরিদৃশ্যমান জগৎও ওঙ্কারই। মাণ্ডুক্য উপনিষদ বলেন : ওঙ্কারই অক্ষর। ভূত, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই তিনকালের প্রভাবের অধীন সমস্ত জগৎ এই ওঙ্কার, থেকেই উৎপন্ন হয়েছে। ত্রিকালের অতীত যা তাও ব্রহ্ম। এই সমস্তই ব্রহ্ম। সমস্ত বেদের এবং সমস্ত সাধনের লক্ষ্য যে এই ওঙ্কারই তাও উপনিষদ থেকে জানা যায়।

লেখক পরিচিতি

শ্রী মনোরঞ্জন দে মুন্সীগঞ্জ জেলার অর্ন্তগত সিরাজদিখান উপজেলার রাজদিয়া গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু কায়স্থ পরিবারে ১৯৫১ সালের ২রা জানুয়ারী জন্মগ্রহণ করেন। মা-বাবা ধর্মপরায়ণ ছিলেন। বাড়ীতে শ্রী রাধাকৃষ্ণের মন্দির থাকায় ছোটবেলা থেকেই শ্রী বিগ্রহদ্বয়ের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। লেখাপড়া করেছেন নিজ গ্রামের রাজদিয়া অভয় উচ্চ বিদ্যালয়, ঢাকা কলেজ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। প্রথমে কিছুদিন কলেজে অধ্যাপনা করেছেন। এরপর বাংলাদেশ ব্যাংক ও পরবর্তীতে অগ্রণী ব্যাংকে উচ্চ পদস্থ ব্যাংকার (সহকারী মহাব্যবস্থাপক) হিসেবে কাজ করেছেন। বি. এ (পাস), বি. এস. এস (সম্মান) এবং এম. এস. এস শ্রেণীতে অধ্যায়নরত ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য এ পর্যন্ত বিভিন্ন বিষয়ের উপর বই লিখেছেন ২৫টি।

শ্রী মনোরঞ্জন দে বিভিন্ন সময়ে সনাতন ধর্মের বিভিন্ন বিষয়ের উপর অনেক নিবন্ধ লিখেছেন এবং এখনও লিখেছেন। বাংলাদেশ জাতীয় হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতির মাসিক পত্রিকা "সমাজ দর্পণ এবং ইস্‌কন কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক "হয়েকৃষ্ণ সমাচার" এবং ত্রৈমাসিক "অমৃতের সন্ধানে" পত্রিকায় এ পর্যন্ত তার লিখিত বহু ধর্মীয় নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

তিনি একজন সৌখিন হস্তরেখাবিদ।